১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

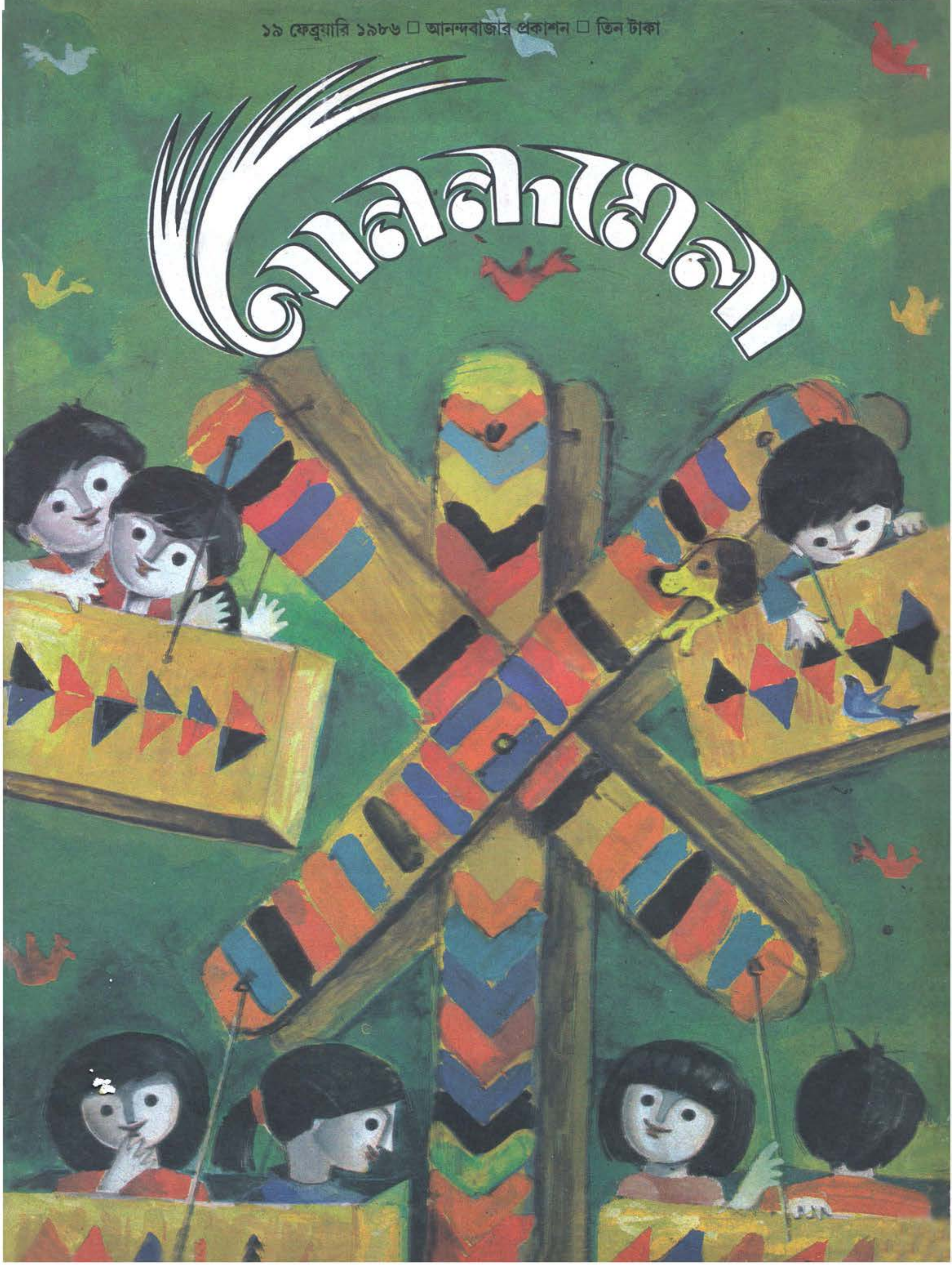

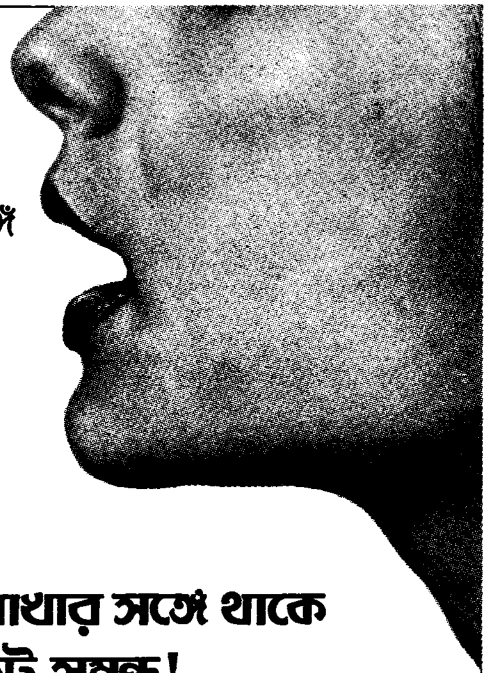

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের সঙ্গে দাঁতের হয়তো কোনো সম্বন্ধ থাকে না—

কিন্তু, মাড়ি সুস্থ রাখার সঙ্গে থাকে অতি নিকট সম্বন্ধ!

আপনার মাড়ি যদি মজবুত না হয়, তাহলে নিঃশ্বাসেও দুর্গন্ধ হতে পারে—আর, তা ডাক্তারি মতেও সত্যি ব'লে প্রমাণিত—

অর্থাৎ, শুধু দাঁতের আপনি যত যত্নই নিন না কেন, কোনো লাভ হবে না—তা, সে আপনি যত স্বাদগন্ধযুক্ত টুথপেস্টই ব্যবহার করুন।

তবে, একটি এমন প্রমাণিত উপায় রয়েছে, যা দিয়ে দাঁত ও মাড়ি দুইয়েরই যত্ন নেওয়া সম্ভব—যা হ'ল, সুবিখ্যাত ফরহ্যান্স উপায়।

ফরহ্যান্স শুধু এক সাধারণ টুথপেস্টই নয়—এটি বিশেষভাবে তৈরী করেন এক দাঁতেরই ডাক্তার—যিনি, দাঁত সুস্থ রাখার সঙ্গে মাড়িরও যে কত অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ থাকে তা ভালরকম বুঝেছিলেন।

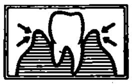

দুর্বল মাড়ি দাঁতকে ধরে রাখতে পারে না, যার ফলে দাঁতে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পোকা ধরতে পারে।

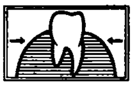

ফরহ্যান্স-এ এক বিশেষ অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট থাকে যা মাড়িকে সত্যি সত্যিই শক্ত করে আর দাঁতকে সুদৃঢ় ও সুস্থ রাখে আর ফলে, আপনার নিঃশ্বাসও হয়ে ওঠে সাফ ও তরতাজা।

তাই, ফরহ্যান্স ব্যবহার করা এখনও না শুরু করে থাকলে, আজই শুরু করুন। তারপর, যত বছরের পর বছর পার হতে থাকবে, তত বুঝতে পারবেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক ফরহ্যান্স-এর বিশেষ যত্নের ওপর কেন এত আস্থা রাখে।

ফরহ্যান্স – আপনার মাড়ির জন্যে তৈরী টুথপেস্ট

Forhan's
FOR THE GUMS
The toothpaste created by a dentist
এবার এক আকর্ষণীয় নতুন প্যাকে!

406-GM-254 BEN

আনন্দমেলা

৭ ফাল্গুন ১৩৯২ ।। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ □ ১১ বর্ষ ২৩ সংখ্যা

ছড়া ও কবিতা

রাজ-যোটক । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮
প্রথম পাঠ । ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ১১

সম্পূর্ণ উপন্যাস

রুক'স নেস্ট । অভিজিৎ চৌধুরী ৩৫

গল্প

কলুটোলার মোড়ে । হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯
লাল খাতার রহস্য । আশিস ঘোষ ১৪

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৫১

শার্লক হোমসের গল্প

সিলভার ব্লেজ । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৪

বিশেষ রচনা

ওস্তাদ সাঁতারু গ্রিব । অনীশ ঘোষ ২৪
সীমা ছাড়ানোর মজা । সুজন দাশগুপ্ত ২৯

বিজ্ঞানবিচিত্রা

ছ' কোটি বছর উজিয়ে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
প্রযুক্তির বিচিত্র খবর । সুজিতকুমার নাহা ১৩
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৪৭

লেখাপড়া

ন্যগ্রোধ···বঞ্জুল···(অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৭
বেচারি চম্বল (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৭

খেলাধুলো

বিশ্বকাপ-ফুটবলের ঘণ্টা বাজছে । অভিষেক রায় ৬২
সেরাদের সেরা লেণ্ডল । অশোক রায় ৬৫
ক্রিকেটারদের গল্প । নৃপতি চৌধুরী ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০

অন্যান্য আকর্ষণ

ডাক্তারবাবু বলছেন । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৪৭
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

BRANOLIA
BRANOLIA
110 ml.
builds brain & body
BRANOLIA
builds brain & body
BRANOLIA CHEMICAL WORKS

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক । যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা । ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক । ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

পরীক্ষার সময় রাতজেগে পড়াশোনার সময়

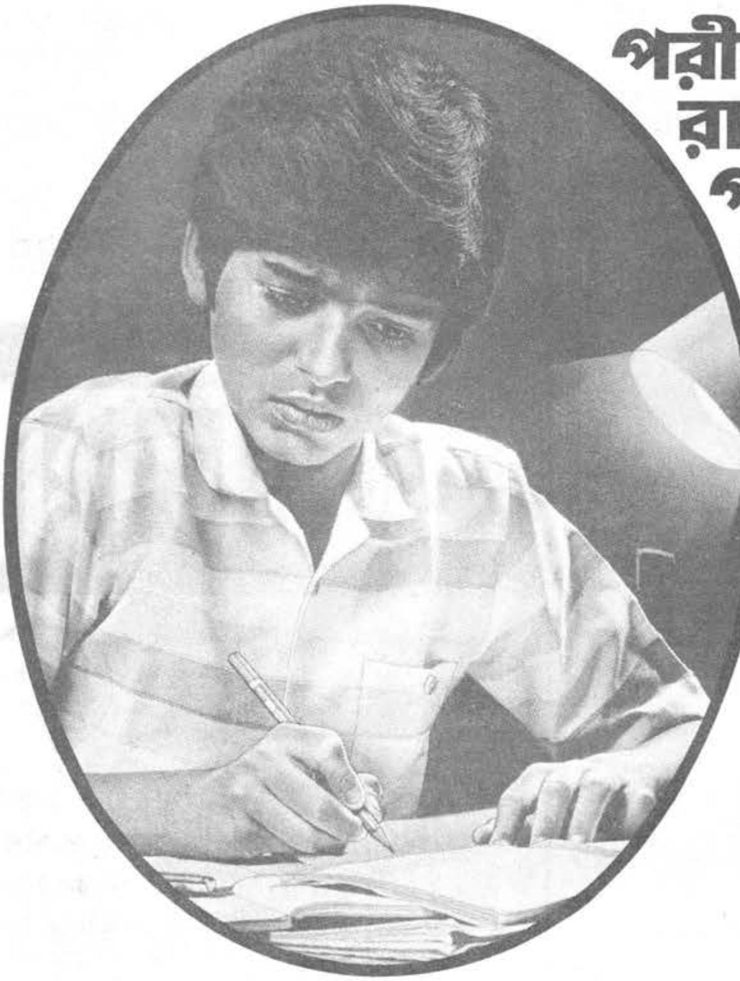

এখনই তো শরীরকে
রাখতে হবে
সম্পূর্ণ সুস্থ...
এখনই তো চাই
কমপ্লান®

একমাত্র কমপ্লানেই আছে একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩ টি খাদ্যগুণ, বাড়তি পুষ্টির জন্য ওর যা এখন দরকার।

সাধারণত ঃ ১৫-১৬ বছর বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েরা সবদিকথেকে পুরোপুরিভাবে বেড়ে ওঠে, তাই তাদের পুষ্টিপ্রয়োজনও হয় বিশেষ ধরণের। আর যখন পরীক্ষার চাপ থাকে তখন তো কথাই নেই। সেইজন্য মায়েরা জানেন যে পরীক্ষার সময় মানেই **কমপ্লানের** সময়।

বাচ্চাদের শরীর গড়ে তুলতে যে-পুষ্টি সরাসরিভাবে সাহায্য করে সেটা হল প্রোটীন। **কমপ্লানে** প্রোটীন তো আছেই (২০%), আছে মিল্কপ্রোটীন, যা বাচ্চাদের জন্য সেরা। তাছাড়া আছে বাইশটি অন্যান্য খাদ্যগুণ, যেমন কার্বোহাইড্রেট, খনিজ ও স্নেহ পদার্থ এবং নানান ভিটামিন। বাড়ন্তবয়সের ছেলেমেয়েদের এগুলি বিশেষ দরকার।

আপনার ছেলেমেয়েদেরও দিনে দুবার করে **কমপ্লান** খাওয়ান।

কমপ্লান পাবেন বাচ্চাদের মনের মত চকোলেট, স্ট্রবেরি, আইস্ক্রীম ও এলাচ-জাফরান স্বাদে। প্লেন-ও পাবেন।

প্রোটিন
ফ্যাট
কার্বোহাইড্রেট
ক্যালসিয়াম
ফসফরাস
সোডিয়াম
ক্লোরাইড (সি এল রূপে)
পটাসিয়াম
আয়রণ
আয়োডিন
ভিটামিন এ
ভিটামিন বি$_1$
রিবোফ্লাভিন
নিকোটিনামাইড
ক্যালসিয়াম
প্যান্টোথিনেট
কলিন
পাইরিডক্সিন (বি$_6$)
ভিটামিন বি$_{12}$
ফলিক অ্যাসিড
ভিটামিন সি
ভিটামিন ডি
ভিটামিন ই
ভিটামিন কে$_1$

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

Complan
Glaxo
Complan®
COMPLETE PLANNED FOOD
STRAWBERRY FLAVOUR

কমপ্লান® – সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

B,84,GLC,2316.13.Ben.

ছ' কোটি বছর উজিয়ে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ছ' কোটি বছর আগে এক দারুণ ভূমিকম্পে অস্ট্রেলিয়া আর তার আশপাশের দ্বীপপুঞ্জ বাকি পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে যায়। মাত্র শ' দুই বছর আগে ইংরেজ কুঠিয়ালরা এসে সেদেশে বসবাস শুরু করে। এর মধ্যে বাইরের কেউ বড় একটা সেখানে পদার্পণ করেনি। বাইরের কোনও জীবজন্তুও যায়নি বলা চলে। তার মানে, ছ'কোটি বছর ধরে আদিম জীবজন্তুরা এখানে বাইরের বিনা প্রভাবে স্বতন্ত্রভাবে বেড়ে উঠেছে।

সমুদ্রের মধ্যেকার এই কাটা-পড়া জলবেষ্টিত মহাদেশে পা দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন। বহির্বিশ্বে স্তন্যপায়ীকুলের যেসব পরিচিত প্রাণী আছে, তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার স্তন্যপায়ীদের চেহারার কোনও মিল নেই। বেড়াল আর বাঘ, কুকুর আর নেকড়ে, হাতি আর ভেড়ার পূর্বপুরুষদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না সেখানে।

ফলে, আর সব দেশে সরীসৃপজাতের স্তন্যপায়ী জীবেরা লুপ্ত হলেও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে আজও জ্যান্ত দেহেই বহাল আছে। কোটি কোটি বছর পর অন্য দেশে জন্মানো উচ্চতর গোষ্ঠীর স্তন্যপায়ীরা ওদেশে এসেছে পত্তনকারী সাহেবদের হাত ধরে।

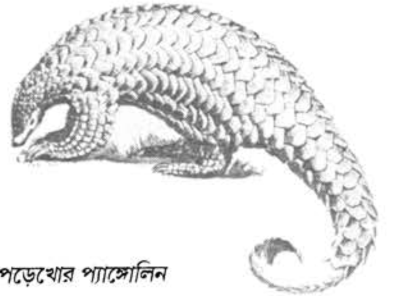

আফ্রিকার পিঁপড়েখোর প্যাঙ্গোলিন

সত্যিই প্রাচীন জীবজন্তুদের দেশজোড়া এক জীবন্ত জাদুঘর এই অস্ট্রেলিয়া। এদের যা বদল হয়েছে, তার পেছনে আছে এদের নিজস্ব ক্রমবিকাশের ধারা।

অস্ট্রেলিয়ায় আজও দেখা যায় দুটো আশ্চর্য প্রাণী, স্পাইনি অ্যান্টইটার বা মেরুদণ্ডী পিঁপড়েখোর প্রাণী আর ডাকবিল বা মরালচঞ্চু। এরা খুবই আদিম একদল স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীভুক্ত, এতই আদিম যে, আসলে এরা পড়ে সরীসৃপ স্তন্যপায়ীর দলে। কুকুর-বেড়ালদের মতোই এদের গায়ে বড় বড় রোঁয়া ; কিন্তু এরা সাপ-কচ্ছপের মতোই খোলাসমেত ডিম পাড়ে।

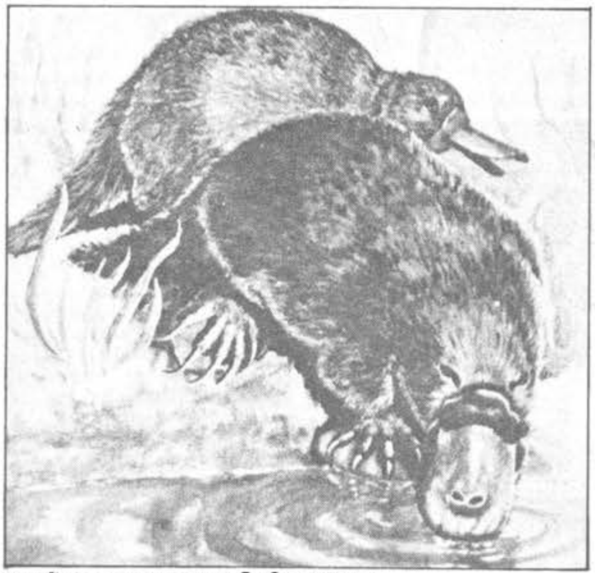

অস্ট্রেলিয়ার মরালচঞ্চু স্তন্যপায়ী জীব প্লাটিপাস

আরেক দল আছে, যাদের বলা হয় মার্সুপিয়াল বা দ্বিগর্ভ প্রাণী। সরীসৃপের সঙ্গে এদের মিল সামান্য হলেও অন্যদিকে এরা আবার পুরোপুরি স্তন্যপায়ীও নয়। ক্যাঙারু আর ওম্বাট হল এই দ্বিগর্ভ জীব। এরা অবশ্য ডিম পাড়ে না, তবে এদের বাচ্চারা পুরো বেড়ে ওঠার আগেই পেট থেকে পড়ে।

ক্যাঙারুর ছানা মাত্র সাত সপ্তাহ পেটে থাকার পর ভূমিষ্ঠ হয়। তখনও তার চোখ ফোটে না ; লম্বায় হয় এক দেড় ইঞ্চি। সেই অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের পেটের বাইরেকার থলির মধ্যে ঢুকে মাতৃস্তনে মুখ লাগিয়ে পড়ে থাকে। প্রায় তিন মাস এইভাবে কাটাবার পর আস্তে আস্তে সে মুখ বার করে। আরও ছ' মাস এইভাবে থেকে যখন বড় হয়, গায়েও জোর পায় তখন মা'র পেটের থলি থেকে বেরিয়ে আসে।

আদিম সরীসৃপের তলপেটের গা একগুচ্ছ হাড়ের ওপর ভর দিয়ে থাকত। স্তন্যপায়ী হওয়া সত্ত্বেও দ্বিগর্ভদের তলপেটেও সেই একই হাড় দেখতে পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ার কোনও- কোনও. দ্বিগর্ভ প্রাণীকে উন্নত জীবদেরই মতন দেখতে। যেমন, কোয়ালা, ভাল্লুকের মতন দেখতে হলেও তারা দ্বিগর্ভ প্রাণী। কিন্তু তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে ওদেশে আমদানি-করা কুকুর বেড়াল খরগোশের হাতে। শেষ পর্যন্ত কি ওদের লাশগুলোই শুধু টিঁকে থাকবে জাদুঘরের কাঁচের বাক্সে ?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধু একটি দ্বিগর্ভ জীব আজও বেঁচে আছে। তার নাম ওপোসাম।

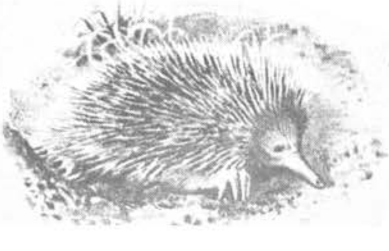

অস্ট্রেলিয়ার পিঁপড়েখোর

সুমীত ব্যবহারে বহুবিধ সুবিধে

এই মেশিনের সব কাজ তার প্রাণকেন্দ্র
থেকে উদ্ভাবিত

এর হেভী ডিউটি মোটর না থেমে ৩০ মিনিট চলতে পারে।
বিশেষ ডিজাইনে তৈরী চারটি ব্লেড ও অল্প পরিমাণ পেষাই করার ক্যাপযুক্ত
এই সুমীত ডোমেস্টিক কিচেন মেশিন কত সহজে রান্নার
মূল সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়।

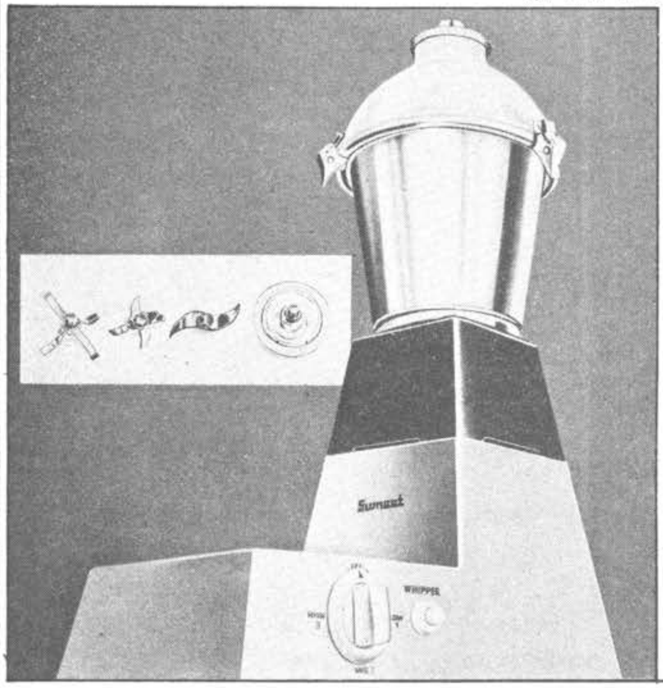
Sumeet
WHIPPER

লঙ্কা আর গরম মশলা
২ মিনিটে শুকনো পেষাই।

কড়াই ডাল, চাল ও নারকোলের
শাঁস ২ মিনিটে ভিজে পেষাই।

মাংস কিমা করে ১ মিনিটে আর
গাজর, পেঁয়াজ, নারকোল ও বাদাম
কুরে দেয়...কয়েক সেকেণ্ডে।

লস্যি, দুধ আর ডিমের সাদা
অংশ ফেটায় ১ মিনিটে।

এখন যোগ হ'ল সুমীত ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেন্ট

সুমীত আপনাকে দিচ্ছে আর একটা বিশেষ সুবিধে— নতুন ঐচ্ছিক ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন! এতে আছে স্বচ্ছ অথচ ভাঙ্গে না এমন একটি ৩.৮৮ লিটারের পাত্র, ৫টি বদলযোগ্য ব্লেড ও ডিস্ক আর রস করবার যন্ত্র। এই অ্যাটাচমেন্টটি আপনি আপনার সুমীত ডোমেস্টিক বেসিক ইউনিটে লাগিয়ে দিন, ব্যস্, আর দেখুন কী বিস্ময় সৃষ্টি করে!

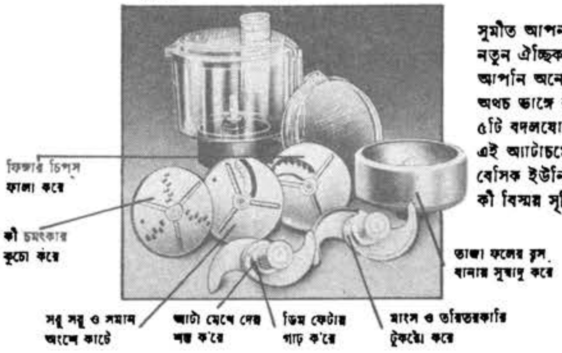
ফিঙ্গার চিপস
ফালা করে
কী চমৎকার
কুচো করে
তাজা ফলের রস
বানায় সুস্বাদু করে
সরু সরু ও সমান
অংশে কাটে
আটা মেখে দেয়
শক্ত ক'রে
ডিম ফেটায়
গাঢ় ক'রে
মাংস ও তরিতরকারি
টুকরো করে

সুমীত®

৪০০ ওয়াট ২২০-২৪০ ভোল্ট~ ৩০ মিনিট রেটিং

শক্তপোক্ত রান্নার ঝক্কি সামলাতে শক্তপোক্ত ভাবে তৈরী।

আমাদের বিনামূল্যে প্রদর্শনী দেখার অপেক্ষায় থাকুন আর সুমীত আপনার কি কি কাজ কি ভাবে করছে—চাক্ষুস দেখুন।

সার্ভিস সেণ্টার:

কলকাতা: কে দত্তপানি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি, ৫৫, এজরা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোন: ২৬৬৭২৮/২৯। সুমীত সার্ভিস সেন্টার (দক্ষিণ) পি-৪৯৮ কেয়াতলা রোড, দু'তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ফোন: ৪৬৬১১৬। **গৌহাটী:** এইচ. ভি. ট্রেডার্স, ডুগার বিল্ডিং, ফান্সী বাজার, গৌহাটি, আসাম-৭৮১০০১ ফোন: ২৮০২৮

OBM/3187 BEN

অর্থ জানো

ন্যগ্রোধ… বঞ্জুল…

প্রতিবছরই আমরা বনমহোৎসব করি বটে, কিন্তু বৃক্ষ সম্বন্ধে আমরা দারুণ উদাসীন। যদি কোনও বনে গিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'ওটা কী গাছ', তবে সে-অরণ্যে তোমার রোদন ছাড়া গতি নেই। নীচের শব্দগুলির প্রতিটির পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **ন্যগ্রোধ**— (ক) অশ্বত্থগাছ, (খ) বটগাছ, (গ) শালগাছ, (ঘ) নিমগাছ।

২। **শাল্মলী**— (ক) সেগুনগাছ, (খ) শালগাছ, (গ) হিজলগাছ, (ঘ) শিমুলগাছ।

৩। **এরণ্ড**— (ক) আশশেওড়া, (খ) ভেরেণ্ডাগাছ, (গ) শিশুগাছ, (ঘ) গাবগাছ।

৪। **বঞ্জুল**— (ক) সজনেগাছ, (খ) কাঁঠালগাছ, (গ) বনচাঁড়াল, (ঘ) অশোকগাছ।

৫। **বোধিবৃক্ষ**— (ক) বটবৃক্ষ, (খ) দেবদারু, (গ) অশ্বত্থগাছ, (ঘ) বিল্ববৃক্ষ।

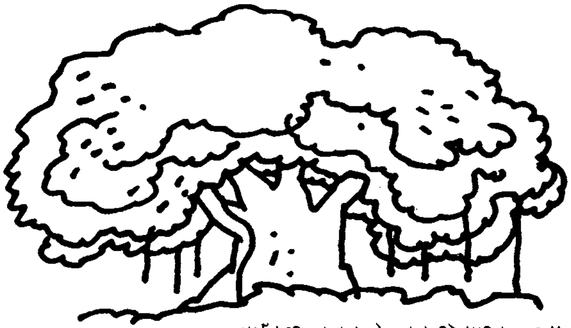

উত্তর : ১। **ন্যগ্রোধ**— (খ) বটগাছ। ন্যক্ অর্থাৎ নিম্নদেশ রোধ বা আবৃত করে যে। বটগাছের ঝুরি ও পাতায় তার নীচের অংশ ঢাকা থাকে। যেমন, 'এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়' (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)।

২। **শাল্মলী**— শিমুলগাছ। যেমন, 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে' (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)।

৩। **এরণ্ড**— (খ) ভেরেণ্ডাগাছ, অর্থাৎ রেড়িগাছ। গাছের মধ্যে সবচেয়ে নিচু জাতের। এর বীজ থেকে তেল হয়। যেমন, 'বৃক্ষের দেশে তুই হবি যে এরণ্ড' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)।

৪। **বঞ্জুল**— (ঘ) অশোকগাছ। যেমন, 'চাহিয়া বঞ্জুলবনে, কী জানি পড়িবে মনে' (রবীন্দ্রনাথ)।

৫। **বোধিবৃক্ষ**— (গ) অশ্বত্থগাছ। অন্য নাম বোধিদ্রুম, দ্রুম অর্থ বৃক্ষ। এরই ছায়াতলে শাক্যমুনি বোধি বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধদেব নামে খ্যাত হয়েছিলেন। যেমন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কোন কোন এরণ্ড এমন মহাবোধিবৃক্ষত্ব লাভ করেছিলেন' (প্রমথ চৌধুরী)।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

বেচারি চম্বল

প্রতি বছরই শীত পড়তে না পড়তে দেখা যায় আমাদের চম্বলবাবু চানের ব্যাপারটাকে কী করে পাশ কাটানো যায়, সেই চেষ্টা আরম্ভ করেছেন। এবার জানুয়ারির প্রথমে কলকাতায় ঠাণ্ডাটা বেশ মোক্ষম রকমই পড়েছিল, কাজেই সে ক'টা দিন চানের কথা যে চম্বল কানেই তুলতে চাইবে না, তাতে আর আশ্চর্য কী!

"Come, come, Chambal, do take a bath once in a while," Mummy said. "Everybody does it."

"Do you want me to catch my death of cold, Mummy?" Chambal would cry out in alarm. "Have you seen today's newspaper? Here, listen to what it says. Fortyone people have died of cold in Uttar Pradesh."

Mrs. Roy said, "That's very sad, indeed. But I don't see what that has to do with it. This is Calcutta, not Lucknow or Allahabad. Look at Milly here. She takes a bath every day and she's alive and well. What she can do, you can do too, can't you?"

"Girls are different," Chambal grunted, "they don't catch a cold easily."

কিন্তু সে-কথা চামেলির কানে গেল না। সে তখন অন্য কথা ভাবছিল।

"If so many people die of cold, Mummy," she urged, "surely, somebody should do something about it?"

Mrs. Roy replied, "It's indeed too shocking for words, and we all know what has to be done about it. We have to bring about a condition in which so many don't have to go without warm clothes, or even a roof over their heads."

"But that's what the government is trying to do, isn't it?"

"Yes, I suppose so."

এবারে এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করো :

What

শব্দটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার কাজেই সবচেয়ে বেশি লাগে, কিন্তু বাক্যের একটা অংশের সঙ্গে আরেকটা অংশ জুড়তেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

যেমন :

We all know /what/ has to be done.
Listen to what it says.
What she can do, you can do, too.
That's what the government is trying to do.

প্রসাদ

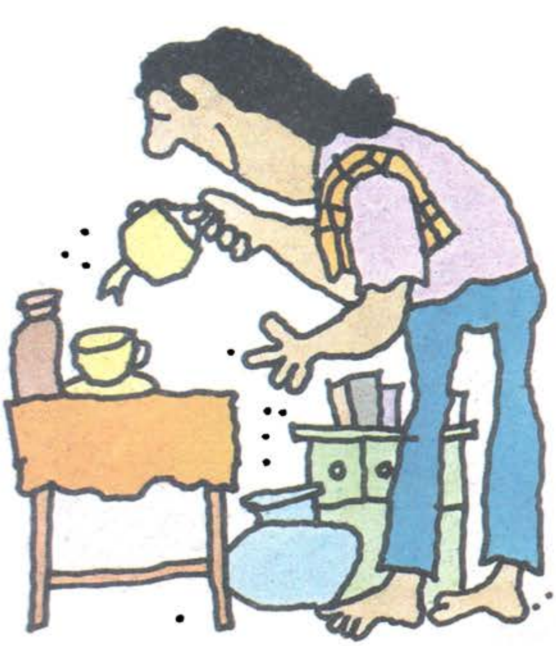

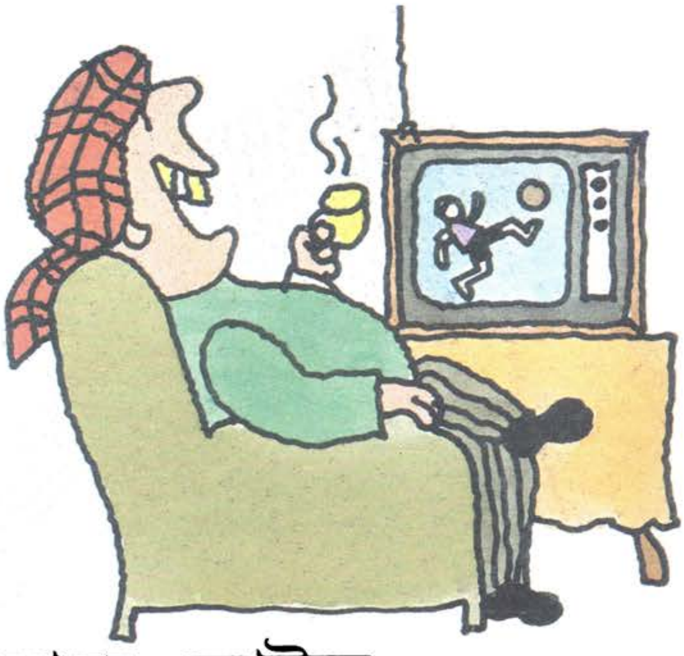

রাজ-যোটক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

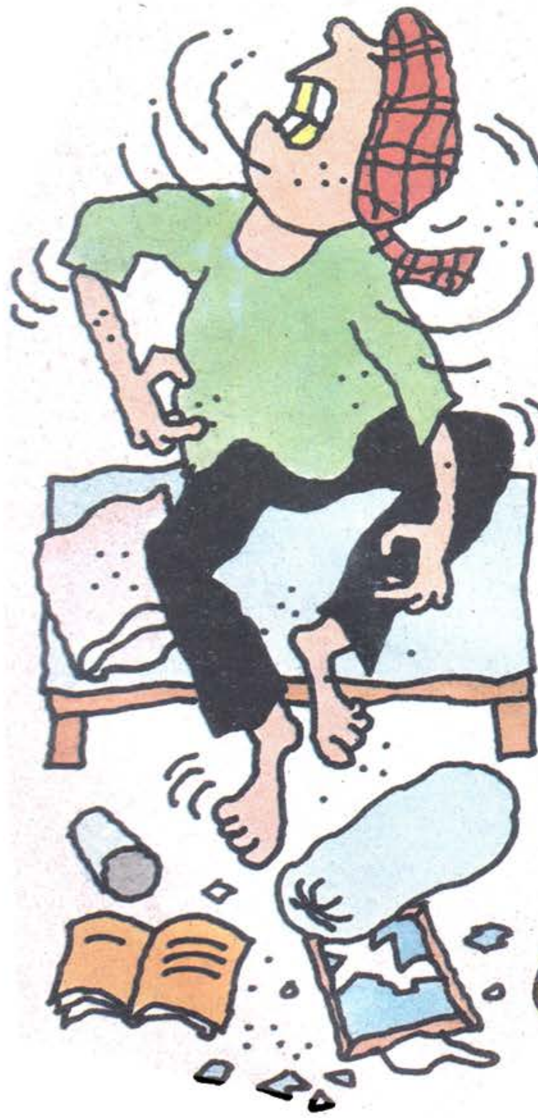

একটি মানুষ কালো কুচকুচ চটপটে কাজকম্মে
আর একজনা সাদা ফুটফুট দন্ত মাজে না জম্মে।
কালোটির নাম কেষ্টকমল মাথায় মস্ত বাবরি
অন্যজনটি ধূম্রলোচন টাকের ওপর পাগড়ি।
কেষ্টকমল বেহালা বাজায় মাঘের শীতের রাত্রে
ধূম্রলোচন তুর্কি-নাচুনে, চুলকুনি সারা গাত্রে।
একজন যদি শনিবার খায় খই বাতাসা ও সিন্নি
অন্যটি তবে সেইদিনই খাবে কোপ্তা-কাবাব ফিরনি।
রে-রে রোদ্দুরে একজন যায় জলায় শাপলা তুলতে
বাকিজনে সেই ফাঁকে শিখে নেয় তালা ভেঙে ঘর খুলতে।
একটি মাত্র ভাই আছে, তাকে অতি ভালবাসে কেষ্ট
সেই ভাই তাকে চাঁটি মেরে বলে, মাথাটি নরম বেশ তো।
আরও সবদিকে মিল খুব যেন আদা আর কাঁচকলাতে
কেষ্ট ধূম্র যমজ দু'ভাই বড় ভাব গলা-গলাতে।

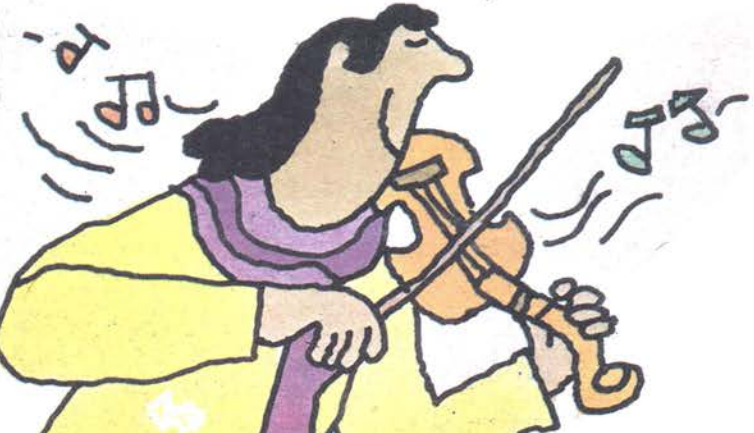

ছবি : দেবাশিস দেব

“সে যে নিকুঞ্জ, তা আপন রা জানলেন কী করে ?”

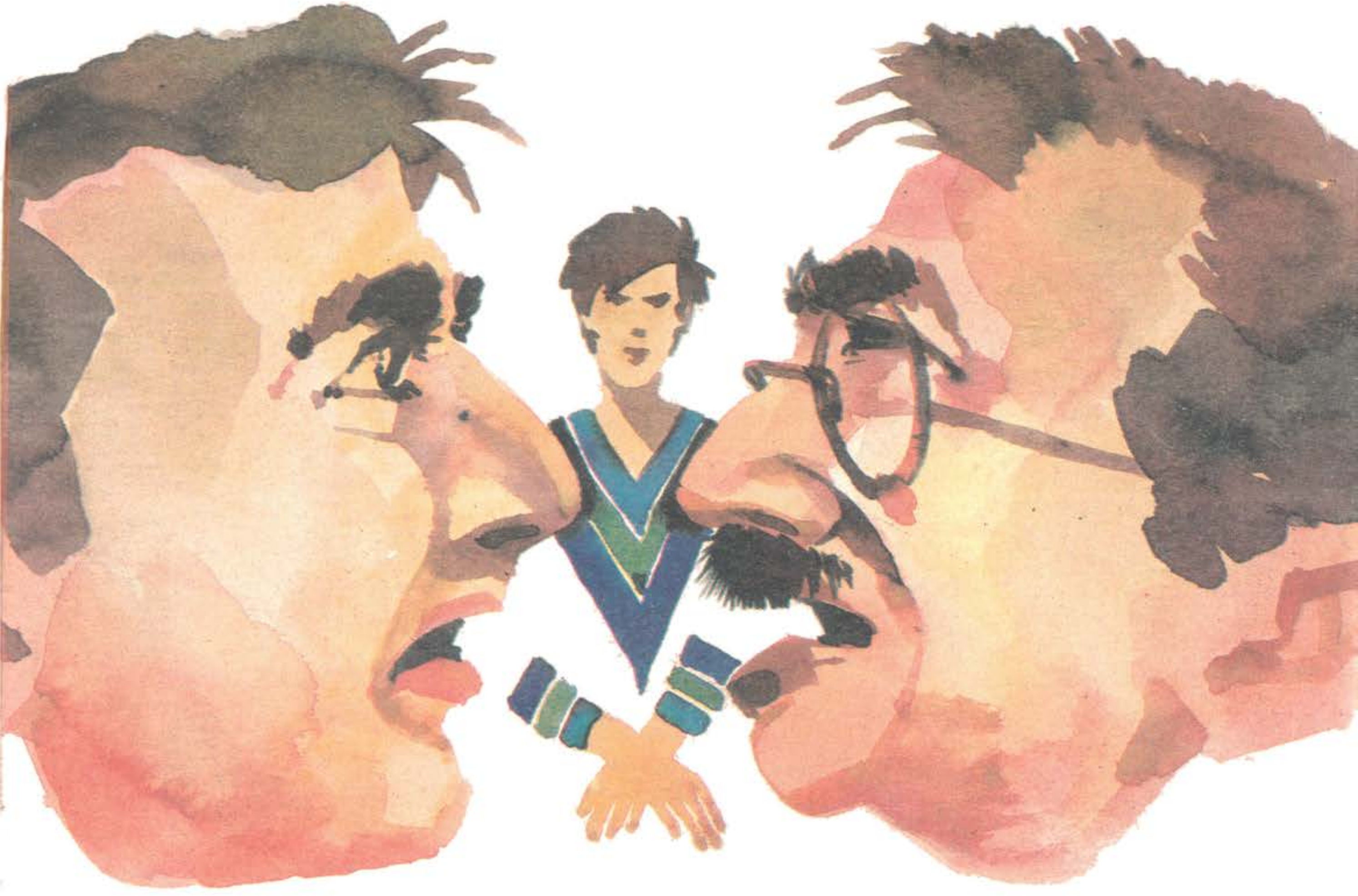

কলুটোলার মোড়ে

হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিপত্তিটা বাধল একেবারে প্রথম দিনই। অথচ সারাটা দিন বলতে গেলে হাওয়ায় উড়েছে বিতু। বাবার গাড়ি নিয়ে আজ প্রথম বেরুবে ও, উৎসাহে চান-খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রায়। মাঝে-মাঝেই ঢুকে পড়েছে গ্যারাজ-ঘরে, বনেট তুলে এটা-ওটা দেখেছে, গাড়ির ভেতরে ঢুকে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট নিচ্ছে, নিদেনপক্ষে তোয়ালেটা একবার ঘষে নিচ্ছে সামনের কাচে। শেষ পর্যন্ত যে এরকম হরিষে বিষাদ হয়ে যাবে, কে জানত !

আসলে, ব্যাপারটা মাথায় ছিল ওর অনেক দিন থেকেই. সুযোগ জুটে গেল মাধ্যমিক পরীক্ষার পর। পুরো তিনমাস চুপচাপ বসে থাকা, একটা কিছু করতে তো হয় ! বিতু ধরে বসল, গাড়ি চালানো শিখব। প্রথমটা বাবা আমল দেননি। অনেক দিন হল শোফারকে বিদায় দেওয়া হয়েছে, বাবার গাড়ি বাবা নিজেই চালান। কাজেই শেখাতে গেলে বাবাকেই শেখাতে হয়। কিন্তু বাবার সময় কোথায়, সকালে চেম্বার, সন্ধেয় নার্সিংহোম, এই নিয়েই তো দিনরাত ব্যস্ত ! বিতু তাতে দমেনি, একটা মোটর-ড্রাইভিং-স্কুলে গিয়ে চটপট রপ্ত করে ফেলেছে ব্যাপারটা। এমনকী, পরীক্ষায় পাশ করে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সও জোগাড় করে নিয়েছে সপ্তাখানেক আগেই। আজকেই প্রথম রাজি করিয়েছিল বাবাকে, সন্ধ্যে বেলা নার্সিংহোম পৌঁছে দেবে বলে। ঝামেলাটা কিনা আজই বাধল !

না, বিতুকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। নিজেদের গলি থেকে অত্যন্ত সাবধানেই সে গাড়িটা বার করেছিল। বাবা বসে ছিলেন পাশে, স্পিড তুলতে ওর হাত নিশপিশ করলেও বাবার জন্যে সেটা সম্ভব হয়নি। ঘটনাটা ঘটল ঠিক কলুটোলায় ঢুকবার মুখে।

ভদ্রলোক যে কেমন করে একেবারে সামনে এসে পড়লেন,

ভাবতে গিয়ে এখনও অবাক হয়ে যাচ্ছে বিতু। যাকে বলে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠা, যেন সেইভাবেই এসে পড়েছিলেন গাড়ির সামনে। সঙ্গে-সঙ্গে পা দিয়ে ব্রেক চেপে ধরেছিল বিতু, কিন্তু যা হওয়ার সেটা তার মধ্যেই হয়ে গিয়েছিল।

তারপরের ঘটনাগুলো মনে করতেই গা ছমছম করে ওঠে এখনও। ভদ্রলোকের কী হয়েছে দেখার আগেই ভিড় জমে গিয়েছিল সেখানে। নানারকম চিৎকার, কটূক্তি, শাসানি! বিতু পাথরের মতো বসে ছিল স্টিয়ারিং ধরে। বাবাই ওদের সাহায্যে ধরাধরি করে ভদ্রলোককে শুইয়ে দিয়েছিলেন পিছনের সিটে। নিজের পরিচয় দিয়ে কাউকে আসতে বলেছিলেন নার্সিংহোমে। সঙ্গে যাবার লোক অবশ্য পাওয়া যায়নি, ভাগ্যিস!

ভদ্রলোক সেই যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন,নার্সিংহোমে নিয়ে আসার পরেও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। পকেট হাতড়ে সুন্দর একটা মানিব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল, তাতেই তাঁর নাম-ঠিকানা জানতে পেরেছিল। নিকুঞ্জ সামন্ত, অ্যাডভোকেট। বাড়ি ভবানীপুর। ওই ভদ্রলোক অ্যাডভোকেট, এ-কথা ভাবতে এখন একটু অবাকই লাগছে বিতুর, যদিও একটু আগেও সে-সব ভাববার মতো মনের অবস্থা ওর ছিল না। ভদ্রলোককে ভাল করে পরীক্ষা করে বাবা ফিরে এসেছিলেন গম্ভীর মুখে, বলেছিলেন, "কপালে দুঃখ আছে মনে হচ্ছে।"

বিতু কথা না বলে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়েছিল বাবার মুখের দিকে। বাবা বলেছিলেন, "অপারেশন করতে হবে। বেঁচে যাবে নিশ্চয়। তবে থানা-পুলিশের হাঙ্গামা হবে। কিন্তু সে তো পরের কথা, অপারেশনের সময় বাড়ির লোকের থাকা দরকার। আমি সিতুকে ফোন করে দিয়েছি, ও এক্ষুনি এসে পড়বে। ওকে সঙ্গে নিয়ে তুই ভদ্রলোকের বাড়িতে যাস।"

সিতু মানে কাকু, ছোটকাকা। বিতু শুকনো মুখে বসে আছে দেখে বাবা একটু হেসেছিলেন; পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছেন, 'ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। যা করবার সিতুই করবে, তুই শুধু ওর সঙ্গে থাকবি।'

সেই থেকে মানিব্যাগটা পকেটে নিয়ে দোতলার বারান্দায় একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে বিতু। ভিতরের বারান্দায় দেওয়াল-ঘড়ি আছে, সেখান থেকে টুং-টাং করে আটটা বাজার শব্দ হল যখন, বিতু ভাবছে ভেতরে গিয়ে একবার দেখবে বাবা অপারেশন-থিয়েটারে ঢুকেছেন কি না, তখনই কাকু এলেন।

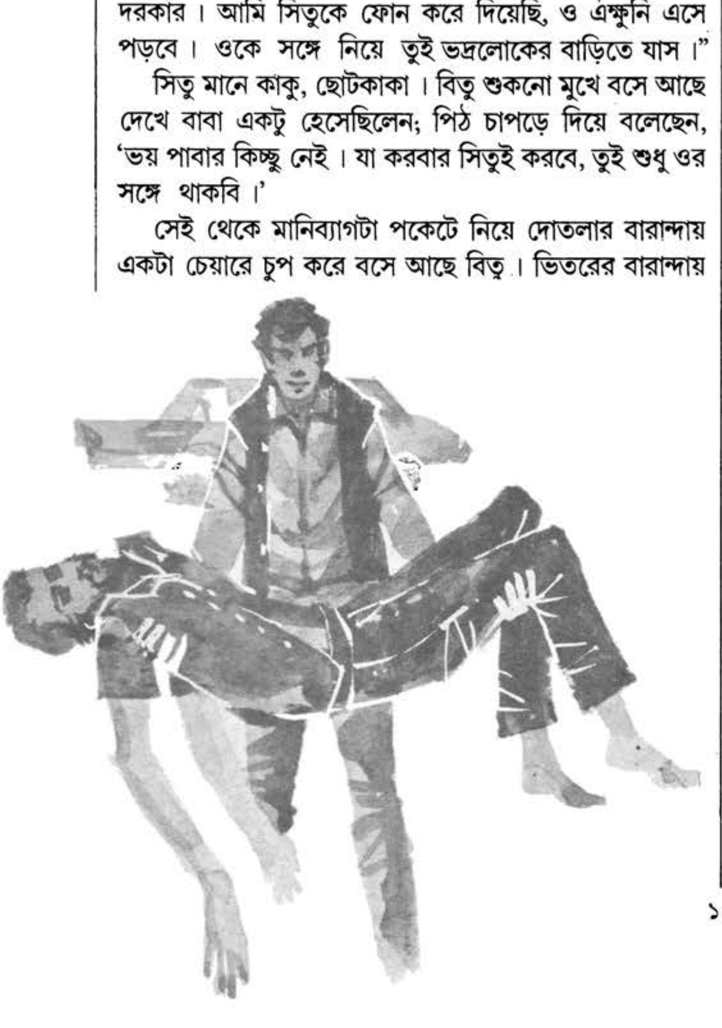

"কী রে, খুব ভয় পেয়ে গেছিস?" কাকু এগিয়ে এসেছেন, "বোকা কোথাকার! আমরা তো আছি, চল, বেরিয়ে পড়ি।"

বিতু পকেট থেকে ব্যাগটা বার করতে যাচ্ছিল, কাকু বললেন, "থাক, থাক, তোর বাবা আমায় সব বলে দিয়েছেন। চল, খিদে-টিদে পায়নি তো?"

খিদে! বিতুর এখন যা অবস্থা! ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল, ও কিছু খাবে না।

ঠিকানা দেখে বাড়িটা খুঁজে বার করতে খুব বেশিক্ষণ লাগল না। পাড়াটা একটু নির্জন। গলির একেবারে শেষ মাথায় বাড়িটা। ছোট দোতলা বাড়ি। দরজার ওপর নেম-প্লেট আঁটা রয়েছে, ভুল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

বিতুর বুকের ভিতরটা ধকধক করছিল। কাকু কলিংবেল টিপলেন। ভিতরের ঘরে কারা যেন কথা বলছিলেন মনে হল, বেল টেপার সঙ্গে-সঙ্গে সেটা থেমে গেল। একটু পরেই দরজা খুলে যে ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে দিলেন, বিতুর মনে হল, সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের একটা ছবির সঙ্গে তাঁর খুব মিল আছে।

"কাকে চাই?"

"বলছি," কাকু বললেন, "একটু ভেতরে যাওয়া যাবে?"

"আসুন।" খুব বেজার মুখে ভদ্রলোক ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। কাকুর দেখাদেখি নিজেও একটা চেয়ারে বসল বিতু। ও বুঝতে পারছিল, নিকুঞ্জবাবুর অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা এখনও এখানে পৌঁছয়নি।

"আমাদের আপনি চিনবেন না, আমরা আসছি আইডিয়াল নার্সিংহোম থেকে," কাকু বললেন, "নিকুঞ্জবাবুর কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?"

"নিকুঞ্জবাবুর কোন্ আত্মীয়কে চাই?" ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

"যে-কোনও একজনকে। কে আছেন বাড়িতে?"

"আমাকে বলা চলবে?"

"কেন চলবে না," বিতু দেখতে পাচ্ছিল, কাকু জোর করে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করছেন। একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "আপনি কি ওঁর—"

কাকুকে প্রায় জোর করে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "ব্যাপারটা কী হয়েছে আগে খুলে বলবেন কি?"

"ব্যাপার, মানে—" কাকু একটু আমতা-আমতা করে বললেন, "নিকুঞ্জবাবুর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। না, মানে তেমন কিছু নয়, তবে—"

"দাঁড়ান দাঁড়ান—" ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "সে যে নিকুঞ্জ, তা আপনারা জানলেন কী করে?"

"জানলাম, মানে—" কাকু এবার বিতুর দিকে তাকালেন, ইঙ্গিতে মানিব্যাগটা বার করতে বললেন। তারপর সেটা হাতে নিয়ে বললেন, "এই ব্যাগটা দেখুন তো, নিকুঞ্জবাবুর কি না!"

প্রায় ছোঁ মেরে সেটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, "বিলক্ষণ! এ ব্যাগ তো নিকুঞ্জেরই বটে।" ব্যাগের ভেতরটা ফাঁক করে এক পলক দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, কী

বলছিলেন বলুন এবার। নিকুঞ্জর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ?”

“হ্যাঁ, এখনও জ্ঞান ফেরেনি আর কি !”

“বুঝলুম, এখনও জ্ঞান ফেরেনি, তারপর ?”

বিতুর ভয় কেটে এবার রাগ ধরে যাচ্ছিল। এ কেমন লোক রে বাবা যেমন করে কথা বলছেন, বোঝা যাচ্ছে ইনি নিকুঞ্জবাবুর কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হবেন। অথচ খবরটা পেয়ে উদ্বেগের কোনও চিহ্ন নেই মুখে, কথাগুলো যেন পাঁচন গেলার মতো মুখ করে গিলছেন।

কাকুও মনে-মনে বিরক্ত হয়েছেন, বুঝতে পারছিল বিতু। কাকু তখন বলছেন, “একটা অপারেশন করা দরকার ওঁর, তাই বাড়ির লোকজন কাউকে যদি একবার সেখানে পাঠানো যেত—”

“পাঠানো যাবে না। আর কী বলার আছে বলে ফেলুন।”

“পাঠানো যাবে না ?” কাকু এমন ধরনের কথা নিশ্চয়ই আশা করতে পারেননি, বললেন, “কিন্তু যদি কিছু অঘটন ঘটে যায়—”

“মানে ?”

“মানে, ধরুন, নিকুঞ্জবাবু যদি শেষ পর্যন্ত না বাঁচেন—”

“বাঁচবেন।”

“বাঁচবেন ?” বিতু আর ওর কাকু একসঙ্গেই বলে উঠেছে।

“হ্যাঁ, বাঁচবেন। কারণ—” ভদ্রলোক তাঁর টিয়াপাখির মতো নাক একটু কুঁচকে বলেছেন, “আমিই নিকুঞ্জ সামন্ত, অ্যাডভোকেট।”

বিতুর মুখ হাঁ ! কাকুর মুখও তাই। গলা দিয়ে আওয়াজ বার হয় না, এমন অবস্থা। শীতকাল, তবু কপাল ঘেমে উঠল বিতুর। শুনতে পেল, কাকু কোনও রকমে বলার চেষ্টা করছেন, “কিন্তু নার্সিংহোমে যিনি আছেন, তাঁর পকেটেই তো ছিল ব্যাগটা, মানে, আপনি কোনওরকম ভুলটুল করছেন না তো ?”

“হোয়াট !” প্রায় পঁচিশটা হাঁড়িচাঁচার গর্জনে দু’জনেই লাফিয়ে উঠেছে একসঙ্গে। ভদ্রলোক চিৎকার করে বলতে শুরু করেছেন, “নিজের নাম ভুল করছি আমি ? কলেজ স্ট্রিটে এই ব্যাগ আমার পকেটমার হয়েছিল বিকেল পাঁচটায়। সঙ্গে-সঙ্গে থানায় ডায়েরি করিয়েছি, ওখেনে একটা, এখেনে একটা।”

আরও অনেক কিছুই বলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু সবটা শোনার মতো মনের অবস্থা ওদের কারওই ছিল না। চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এবার ছিটকে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। তারপরই সোজা দৌড়। থামল গিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় উঠে।

কাকু তখনও পিছনে। কাছে আসতে বিতু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকু হাতের ইশারা করলেন। অর্থাৎ, দাঁড়া, একটু দম নিই। একটু পরে বললেন, “বল, এবার কী বলবি !”

“যে লোকটাকে বাবা অপারেশন করছেন, সে তা হলে নিকুঞ্জ সামন্ত নয় ?”

কাকু দু’দিকে ঘাড় নাড়লেন।

“তবে ?”

“নিকুঞ্জ সামন্তর পকেটমার।”

ছবি : অনুপ রায়

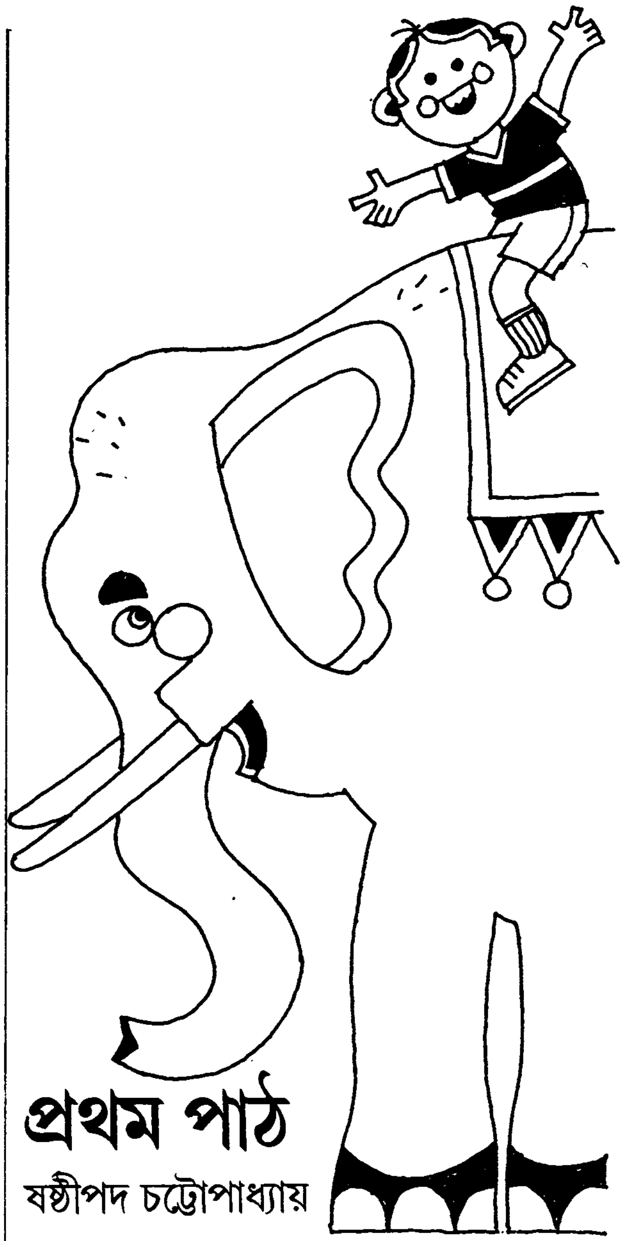

প্রথম পাঠ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

অজয় বড় ভাল ছেলে, সবাই সেটা জানে,
আমায় খুবই ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, মানে।
ইস্কুলেতে যাবার সময় প্রণাম করে মা'কে,
ঈর্ষা দ্বেষে জটিল সে নয়, মন ভরা নয় পাঁকে।
উৎসাহেতে বুকটি বাঁধা, কোমল হৃদয় তার,
ঊর্ধ্বগতি, তার কাছে তাই সবাই মানে হার।
ঋজু দেহ, সহজ সরল, উন্নত তার শির,
৯ এর মতো নয়কো গড়ন, চলার গতি ধীর।
একটি দুটি টাকা পেলেই চিড়িয়াখানা যায়,
ঐরাবতের পিঠে চড়ে বড়ই মজা পায়।
ওজন রেখে কথা বলে, সবাই ভালবাসে,
ঔষধেতে বিতৃষ্ণা তার, চোখের জলে ভাসে।

ছবি : দেবাশিস দেব

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

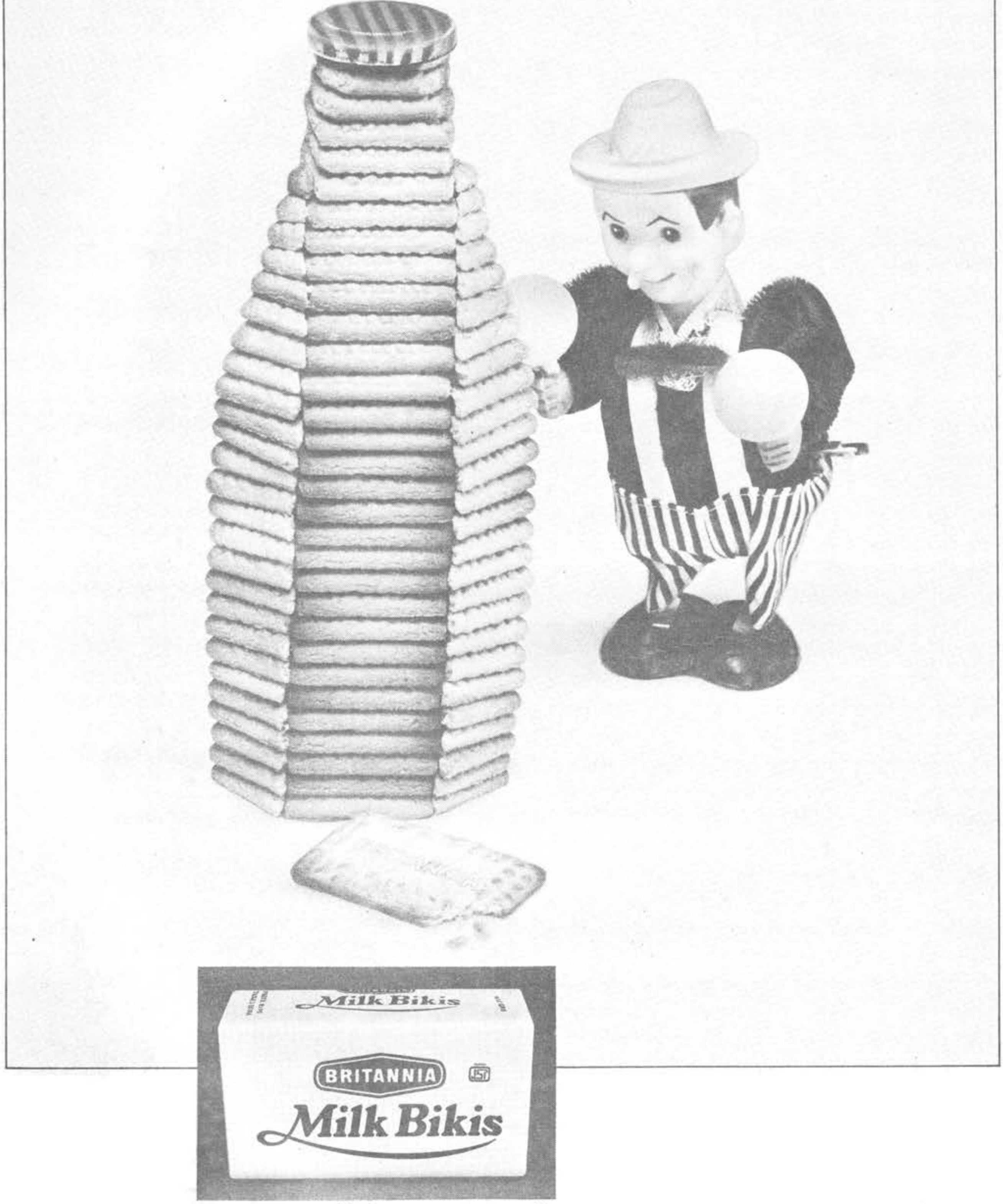
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis

সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

LINTAS BIN MB 12 2720 BG

প্রযুক্তির বিচিত্র খবর

সুজিতকুমার নাহা

'ইলেকট্রনিক মাছ'

সমুদ্রের গভীরে আছে এক আশ্চর্য জগৎ। এখানে বাস করে রঙ-বেরঙের কত বিচিত্র জীব ! অপার বিস্ময়ে ভরা সমুদ্র কিন্তু আমাদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণই অপরিচিত। শুধুমাত্র বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডুবুরিরাই নানাবিধ সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে প্রবেশ করতে পারেন সমুদ্রের অভ্যন্তরে। সমুদ্রের ভেতরের এই রহস্যঘন জগৎকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসবার জন্য প্রযুক্তিবিদেরা বেশ কিছুদিন ধরেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলেই উদ্ভাবিত হয়েছে আশ্চর্য এক যন্ত্র-ডুবুরি, মজা করে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেকট্রনিক মাছ'। এটি একটি বিশেষভাবে নির্মিত যান, যেটি সমুদ্রের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে পারবে প্রায় মাছেদের মতোই সাবলীলভাবে। একটি তারের মাধ্যমে মূল জাহাজের সঙ্গে যানটি থাকবে সংযুক্ত। জাহাজ থেকেই এই যানটিকে সমুদ্রের ভেতর মর্জি-মাফিক এধার-ওধার চালানো যাবে। যানটিতে লাগানো আছে টেলিভিশন ক্যামেরা, যার সাহায্যে জাহাজে বসেই সমুদ্রের অভ্যন্তরে রঙিন ছবি দেখা সম্ভব হবে টেলিভিশনের পর্দায়।

ইলেকট্রনিক মাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রযুক্তিবিদ।

'মহাকাশে তৈরি'

'মহাকাশে তৈরি' ('মেড-ইন-স্পেস') লেবেল লাগানো সামগ্রী হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই আমরা দেখতে পাব ! জেনে অবাক হবে, মহাকাশে তৈরি একটি জিনিসের বিক্রি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আমেরিকায়। জিনিসটি হচ্ছে এক ধরনের প্লাস্টিকের গোলক। গোলকগুলো এতই ছোট যে, একশোটি গোলককে পাশাপাশি রাখলে দুই প্রান্তের মধ্যে দূরত্ব হবে ঠিক এক মিলিমিটার। এগুলো প্রস্তুত করা হয়েছিল 'চ্যালেঞ্জার'-এর মহাকাশ ফেরির সময়। মহাকাশে ভারশূন্য পরিবেশে উৎপন্ন হওয়ার ফলে এগুলোর আকার একেবারে নিখুঁতভাবে গোল। পৃথিবীর কোনও কারখানাতেই এত নিখুঁত গোলক বানানো সম্ভব নয়।

নিশ্চয়ই ভাবছ, লিলিপুট গোলকগুলো কী কাজে লাগবে যে, এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে এগুলো তৈরি করা হল ! প্রসাধন-সামগ্রী, কালি, রং ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য বানানোর জন্য খুব মিহি গুঁড়োর দরকার হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের সঠিক মান বজায় রাখবার জন্য গুঁড়োর কণাগুলো যথাযথ মাপের হওয়া প্রয়োজন। খুব ছোট কণা দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। একই যন্ত্রের সাহায্যে কণাগুলোর মাপজোকও করা যায়, অবশ্য যদি তুলনা করবার জন্য হাতের কাছে থাকে সুনির্দিষ্ট মাপের গোলক। বলা বাহুল্য, তুলনা করবার জন্য যে গোলকগুলোকে ব্যবহার করা হবে, সেগুলোর আকার যত নিখুঁত হবে, মাপজোকের ব্যাপারটাও তত নির্ভুল হবে।

ইলেকট্রনিক মাছের মধ্যে লাগানো আছে টেলিভিশন-ক্যামেরা, তাই জাহাজে বসেই ছবি দেখা যায় সমুদ্রতলের

জলজন্তুরা নিশ্চিন্ত

শিকাগো শহরের 'জন শ্যেড অ্যাকোয়ারিয়াম'-টির খুবই নামডাক। প্রায় সাড়ে পাঁচশো রকমের জলজন্তুর দেখা মিলবে এখানে। এই অ্যাকোয়ারিয়ামের বাসিন্দার সংখ্যা অবশ্য পাঁচ হাজারেরও বেশি। দু'শোটি পেল্লায় সাইজের জলাধারে এদের রাখা হয়েছে। এদের কেউ হয়তো পৃথিবীর উষ্ণ এলাকার অধিবাসী, আবার কেউ হয়তো এসেছে মেরু অঞ্চল থেকে। কারও পছন্দ মিঠে জল, কেউ চায় লবণাক্ত জল।

মিঠে ও লবণাক্ত, দুই রকমের জলের ক্ষেত্রেই তিনটি ভিন্ন উষ্ণতা (গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, সাধারণ ও ঠাণ্ডা) বজায় রাখবার পৃথক বন্দোবস্ত এখানে রয়েছে। এ ছাড়াও আছে জলাধারের জলকে বিশুদ্ধিকরণ ও সঞ্চালনের জন্য অত্যন্ত জটিল ব্যবস্থা। কাজেই অক্টোপাস, সিন্ধুঘোটক, হাঙর, সিলমাছ, কাছিম ইত্যাদি জলজন্তুদের অসুবিধে হবার কোনও কারণই নেই ! ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এদের সুখ-সুবিধের জন্য প্রয়োজন হয়েছে প্রায় দশ হাজার যন্ত্রাংশের।

গৃহভৃত্যের ভূমিকায় রোবট ?

উন্নত দেশগুলোর কলকারখানায় রোবট বা যন্ত্রমানবের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। এরা ক্লান্ত হয় না, অসুস্থ হয় না, কাজে ফাঁকি দেয় না, এমনকী মাইনে পর্যন্ত চায় না। এদের হৃদয় নেই, নেই কোনও ব্যথা-বেদনা, রাগ-অনুরাগ।

রোবট-নির্মাতা কিছু প্রতিষ্ঠান নাকি এখন 'প্লান' করছেন যে, তাঁরা গৃহস্থালির কাজকর্ম করতে পারবে এমন ধরনের রোবট তৈরি করবেন। সকালবেলা সকলকে ঘুম থেকে ওঠানো, চা, কফি, প্রাতরাশ বানানো, থালাবাসন ধোওয়া, ঘরদোর সাফসুতরো করা, ইত্যাদি হরেক কাজে এই রোবটগুলো হবে নাকি খুবই পারদর্শী !

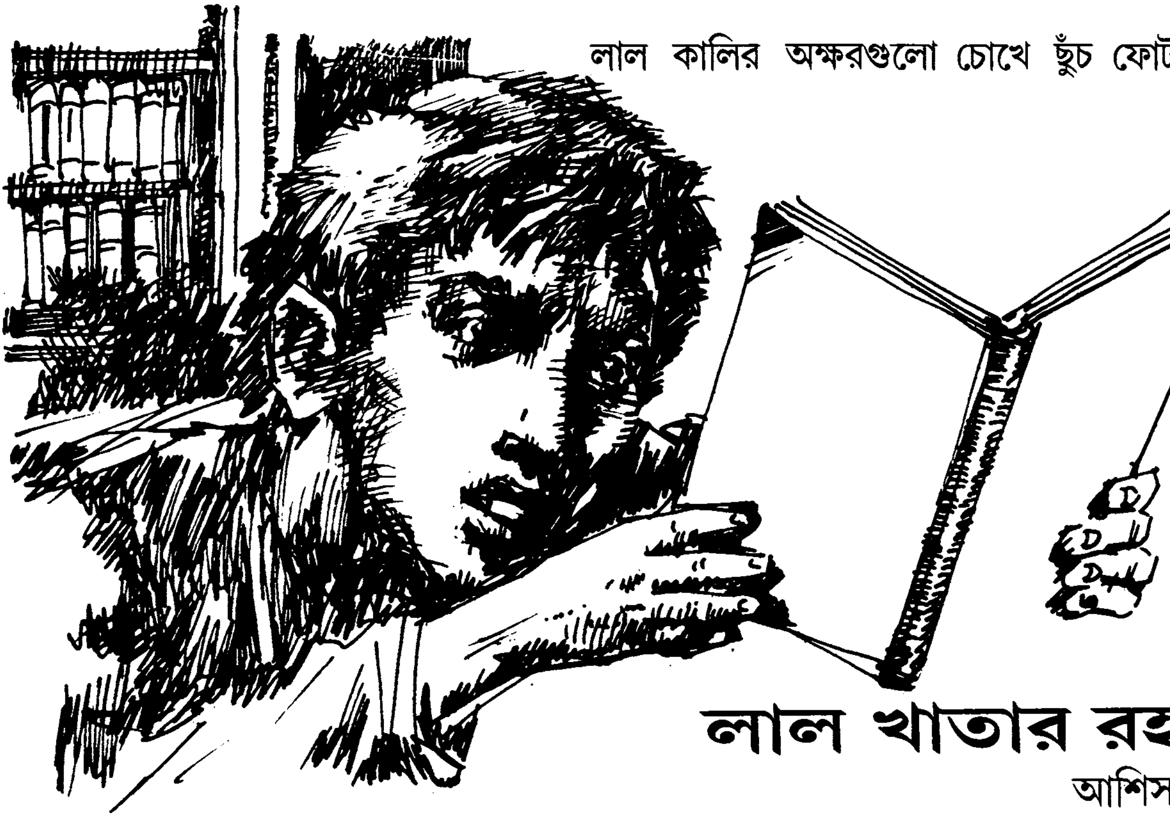

লাল কালির অক্ষরগুলো চোখে ছুঁচ ফোটাচ্ছে…

লাল খাতার রহস্য

আশিস ঘোষ

রাতে ঘুমোনোর আগে নিলয় রোজ গল্পের বই পড়ে। বই না পড়লে ঘুম আসে না। নীচে বসবার ঘরে অনেক রকমের বই আছে। পছন্দমতো একটা নিয়ে আসে। আজও বই আনতে এক-তলার ঘরে চলল। ছোট ভাই প্রলয় পাশের খাটে ঘুমোচ্ছে। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় নিলয়। অন্ধকারে লুসি কোথায় ছিল কে জানে, সামনে এসে লেজ নাড়তে শুরু করল।

শুধু বারান্দা নয়, দোতলার সব ক'টা ঘরই এখন অন্ধকার। দরজাও বন্ধ। রাত তো কম হয়নি। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিলয় সিঁড়ির দিকে এগোতেই, লুসি এক ছুটে নীচে চলে গেল। কয়েক ধাপ নেমেই, আবার ওপরে উঠে এল। ডাইনিং হলে হালকা নীল আলো জ্বলছে। সব ঘরের দরজা ভেজানো। নীচের বসবার ঘরটাই লাইব্রেরি। আলো জ্বেলে ভেতরে ঢোকে নিলয়। মাঝারি মাপের ঘর। দেওয়াল-আলমারিতে বই ঠাসা। পুরনো আমল থেকে সব জমা হয়েছে। নিলয় ডানদিকের আলমারিটা খুলে বই দেখতে থাকে। সব ক'টা তাকেই বই ঠাসা। ওপরের তাকের নীচেরটায় চামড়ায় বাঁধানো চারটে লাল খাতা। ওগুলোতে বাবা হাত দিতে বারণ করেছেন। নিলয় কিন্তু লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখেছে। কার যেন ডাইরি। কবিতা গান এসবও আছে। একটা টেনে নেয় নিলয়। এখন তো আর বাবা দেখতে পাবেন না। বাবা তো বাড়িতেই নেই। অফিসের কাজে বাইরে গেছেন। ফিরতে এখনও দশ-বারো দিন। নিলয় খাতাটা নিয়ে আলমারির পাল্লা বন্ধ করে। কী লেখা আছে, আজ ভাল করে দেখতে হবে। আলমারির দিকে আর-একবার চেয়ে দ্যাখে নিলয়। চারটে তাকই ঠাসা। শুধু এই খাতার জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল।

আলো নিভিয়ে আবার বাইরে আসে নিলয়। সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। লুসি ডাইনিং টেবিলের নীচে শুয়ে ছিল। নিলয়কে দেখে ছুটে এল। কিন্তু গায়ের গন্ধ শুঁকে, কেমন এক অদ্ভুত শব্দ করে দূরে সরে গেল। থমকে দাঁড়ায় নিলয়। লুসি ওরকম করল কেন ? নিলয় হাত নেড়ে ডাকে। লুসি আরও কিছুটা দূরে সরে যায়। ওপরে নাক তুলে কিসের যেন গন্ধ শোঁকে। লুসিকে লক্ষ করে নিলয়। চারপাশটা ভাল করে দেখে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। লুসিও প্রায় গা ঘেঁষেই ওপরে উঠে যায়। তারপর নীচের দিকে মুখ করে গরগর করতে থাকে। নিলয়ের কেমন যেন ভয় হয়। ওপরে উঠতে উঠতেই নীচের দিকে তাকায়। ভাল করে দেখার চেষ্টা করে। নীচের সব ঘরের দরজাই বাইরে থেকে ভেজানো। ডাইনিং হলের আলোটা আগের মতোই জ্বলছে। কোথাও কোনও সাড়া-শব্দ নেই। সবাই ঘুমোচ্ছে। তা হলে লুসিটা ওরকম করছে কেন ? হাত নেড়ে লুসিকে ডাকে নিলয়। লুসি আরও দূরে সরে যায়। খাতাটা নিয়ে নিলয় আবার ঘরে ঢোকে।

ঘুম আসে না। নিলয় শুয়ে-শুয়েই খাতার পাতা ওলটাতে থাকে। অনেক দিন আগে লেখা। সবুজ কালি আবছা হয়ে এসেছে। এ-সব কার হাতের লেখা ? শেষের দিকের কয়েকটা পাতা সাদা। নিলয় অন্যমনস্কভাবে খাতার দিকে চেয়ে থাকে। তাদের এক তান্ত্রিক পূর্বপুরুষের কথা সে শুনেছে। নানা রকম গল্প শুনে সে তাঁর একটা চেহারাও মনে-মনে তৈরি করে নিয়েছে।

বেশ লম্বা-চওড়া। ফর্সা। মাথা ভর্তি পাকা চুল। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাতে ছড়ি নিয়ে, তিনি হেঁটে চলেছেন। কিংবা নীচের বসবার ঘরে বসে বই পড়ছেন। তাঁর এরকম ছবি সে বেশ কয়েকবার স্বপ্নেও দেখেছে।

খাতাটা নাকের কাছে ধরে নিলয়। কেমন পুরনো পুরনো

গন্ধ। উঠে বসে নিলয়। প্রলয়টা আগের মতোই বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। কী ঘুম রে বাবা! ঘরে এই যে আলো জ্বলছে, সে বাইরে গেল, এল,ও কিছুই টের পেল না। আবার বাইরের বারান্দায় যায় নিলয়। এদিক-ওদিক তাকায়। অন্ধকার বারান্দার কোথাও লুসিকে দেখতে পায় না। নীচে যায়। আলো জ্বেলে বসবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। খসখস শব্দ। কে যেন হাঁটছে। গলা-খাঁকারি দিয়ে একটু অপেক্ষা করে নিলয়। কে হতে পারে? বাড়িতে কেউ তো জেগে নেই। ভেতরে উঁকি দেয়। কই, কেউ নেই তো! তবে কি মনের ভুল?

নিলয় ভেতরে যায়। খাতাটা টেবিলে রেখে, আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এ কী! তখন তো একটা খাতাই নিয়েছিল। আরও তিনটে ছিল পাশাপাশি। কিন্তু এখন দুটো দেখছে কেন? আর-একটা কোথায়? জায়গাটা ফাঁক হয়ে আছে। এতটা ফাঁক তো ছিল না। নিলয় এদিক-ওদিক চেয়ে দ্যাখে। একটু আগে টেবিলে খাতাটা যেখানে রেখেছিল, সেখানেই আছে। কিন্তু আলমারিতে আরেকটা খাতা কোথায়! কেউ সরিয়েছে? কে নিতে পারে? প্রলয় ঘুমোচ্ছে। মা, মামাই,ওরাও তো ঘুমে। বাবা বাড়ি নেই। তা হলে! নিলয় অন্য তিনটে দেওয়াল-আলমারির দিকে তাকায়। সবগুলোতেই বই ঠাসা। এরকমই তো ছিল। হাসি পেল নিলয়ের। ঘুম না আসায় মাথা গরম হয়েছে। একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশি ভাবা হচ্ছে। রাত প্রায় একটা বাজে। মাথাটা ভীষণ ভারী মনে হচ্ছে। টেবিল থেকে খাতাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি আলমারিতে রাখল। পাল্লা বন্ধ করে ভাল করে দেখে নিল নিলয়। শুধু খাতার জায়গাটা ছাড়া, আর কোথাও ফাঁক নেই। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে দেখতে হবে। আলো নিভিয়ে বাইরে আসে নিলয়। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। ওপরের ঘরের দরজা খোলাই আছে। লুসি চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দরজা আঁচড়াচ্ছে। গরগর করছে। নিলয়কে দেখেই পাশে সরে গেল। লুসিটা ওরকম করছে কেন? নিলয় দরজায় দাঁড়িয়ে লুসিকে দ্যাখে। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

সকালে বারান্দায় বসে নিলয় কাগজ পড়ছিল। মামাই সামনে এসে দাঁড়াল, "দাদামণি, তোমার কপালে ওটা কিসের দাগ?"

"দাগ? দাগ কোথায়?" ছোট বোনের কথায় কাগজ সরিয়ে নিলয় সোজা হয়ে বসে।

মামাই, ছোট্ট মামাই,হাত তুলে বলে, "ওই তো, তুমি টিপ পরেছ?"

নিলয় হাসতে থাকে, "দূর, টিপ পরব কেন?"

"হ্যাঁ তো, সিঁদুরের টিপ," বলেই রান্না-ঘরের দিকে ছোটে। "মা, দাদা না..."

খটকা লাগে নিলয়ের। উঠে গিয়ে বেসিনের আয়নায় মুখ দ্যাখে। কই, কিছুই তো চোখে পড়ছে না। ভাল করে দেখার চেষ্টা করে নিলয়। না, কোনও দাগ নেই। মামাইটা কী দেখেছে, কে জানে। রাতে খাতার লাল রঙ লাগেনি তো? যদি লেগেই থাকে তো সে কেন দেখতে পাচ্ছে না? নিলয় একতলার দিকে পা বাড়ায়।

ছোট ভাই প্রলয় বাইরের ঘরে বসে স্কুলের পড়া করছিল। লুসি পায়ের কাছে বসে। নিলয় যেতেই লুসি উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে থাকে। কিন্তু কাছে এসে গায়ের গন্ধ শুঁকেই চট্‌ করে পিছনে সরে যায়। গরগর শব্দ করতে থাকে। থমকে দাঁড়ায় নিলয়। প্রলয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও মুখ নিচু করে বইয়ের পাতা ওলটাতে শুরু করল। নিলয় সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "কী রে, স্কুল নেই?"

দাদার দিকে প্রলয় অবাক হয়ে তাকাল, "আজ তো রোববার।"

ও, তাই তো! আজ যে রোববার একেবারে খেয়াল ছিল না। তাকেও তো কলেজ যেতে হবে না। লজ্জা পেল নিলয়। প্রলয়টা কী ভাবছে, কে জানে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে লুসি একভাবেই চেয়ে আছে। প্রলয়কে এখন কী বলা যায়?

"দাদা।"

"কী রে?"

স্থির চোখে দাদার দিকে চেয়ে থাকে প্রলয়,"তোর কপালে ওই আবছা দাগটা কিসের?"

চমকে ওঠে নিলয়, "কোথায় দাগ?"

"ওই তো, মনে হচ্ছে আঙুলের ছাপ..."

হাত নাড়ে নিলয়। "মামাইও বলছিল। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

নিলয়ের অস্বস্তি হতে থাকে। প্রলয়টা এমনভাবে চেয়ে আছে যে, ওর সামনে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। নিলয় বইয়ের আলমারির দিকে তাকায়। বইয়ের দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। খাতার জায়গায় সে-ফাঁকটা আর নেই। প্রায় লাফ দিয়েই আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিলয়। চারটে খাতাই আছে। কোনও ফাঁক নেই আলমারিতে। তবে কাল রাতে কী দেখেছিল? স্পষ্ট মনে আছে, কাল একটা খাতা ছিল না। জায়গাটা ফাঁক হয়ে ছিল। এখন কিন্তু একটুও ফাঁক নেই। একেবারে ঠাসা। অত রাতে খাতাটা কে নিয়েছিল? এবং সাত সকালেই আবার রেখে গেছে। নিলয় ছোট ভাইয়ের দিকে তাকায়, "হ্যাঁ রে, এই খাতাগুলো থেকে তুই কি একটা নিয়েছিলি?"

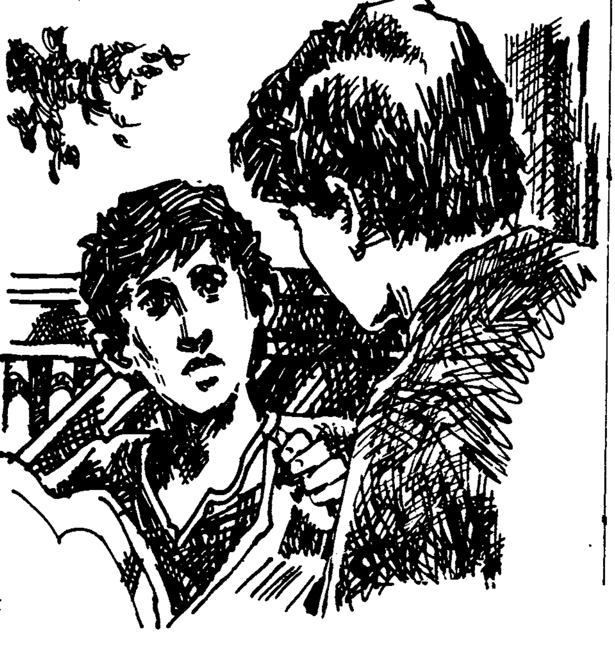

প্রলয় অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, "আমি ? কই, না তো···ঠিক বলছিস্ ?" মুখ কালো করে প্রলয়, "বইয়ের আলমারিতে আমি কখনও হাত দিই না···"

নিলয় তাকের বইগুলো ভাল করে দ্যাখে। তাই তো, প্রলয়কে কখনও এসব বইতে হাত দিতে দ্যাখেনি। মামাইয়ের প্রশ্নই আসে না। মা'র সময় নেই। বাবাও বাড়ি নেই। কাল রাতে ভুল দ্যাখেনি তো ? অত রাতে ঘুম আসায় হয়তো মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। উলটোপালটা সব ভেবেছে, দেখেছে। সকালে এখন সবার কাছে বোকা হতে হচ্ছে। নিলয় লজ্জা পেয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়।

সারাদিন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে নিলয়। কোনও কিছুতে মন বসে না। রাতের ঘটনা বারবার মনে পড়তে থাকে। কপালে ওরা কিসের দাগ দেখেছিল ? সে কেন দেখতে পায়নি ? বইয়ের তাকই বা অমন খালি হয়ে আবার ভরে গেল কেন ? নানারকম চিন্তা মনে আসে। সারা দিনটা ঘরে বসে নিলয় এসবই ভাবতে থাকে। ভাল ঘুম না হওয়ায় খুব ক্লান্ত লাগছে। বিকেলে আর বাইরে বেরুতে ইচ্ছা করে না। চেয়ারটা জানলার কাছে টেনে চুপচাপ বসে থাকে নিলয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। ঘরের ভেতরটাও ক্রমশ আবছা হয়ে আসে। উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালতেও ইচ্ছে করে না। ঘর অন্ধকার দেখে মা একসময় আলো জ্বালতে ঘরে ঢোকেন। নিলয়কে ওভাবে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ান, "কী রে, তোর কি শরীর খারাপ ?"

চেয়ারে গা এলিয়েই নিলয় বলে, "কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। মাথাটা ভার মনে হচ্ছে।"

আরও কাছে এসে মা কপালে হাত দেন, "ঘরে বসে না থেকে বাইরে একটু ঘুরে এলেই তো পারিস।"

মাথা নাড়ে নিলয়, "ভাল লাগছে না।"

ছেলের দিকে চেয়ে, মা কী যেন চিন্তা করেন। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। নিলয়ও উঠে পড়ে। বেসিনে গিয়ে চোখে মুখে জল ছিটোয়। মাথাটা ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে।

নিলয় রাতে একটু তাড়াতাড়িই নীচে নামল। আসলে ওই খাতাগুলোর চিন্তা মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আর-একবার ভাল করে দেখা দরকার। নীচে নামার সময় লুসিও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। বাইরে থেকে ঘরের আলো জ্বালল নিলয়। লুসি ঠিক পিছনেই, ওকে তাড়িয়ে ঘরের দোর বন্ধ করল নিলয়। এখন নিরিবিলিতে বসে সব কটা খাতা দেখতে হবে। আলমারি খুলে একটা লাল খাতা বের করল। খুলেই চমকে উঠল। কাল দেখেছিল শেষে কয়েকটা পাতা সাদা। আজ দেখছে একটা পাতায় সবুজ কালিতে স্পষ্ট লেখা : যা চেয়েছিলাম, পাইনি, অনেক কিছু জানতে হবে···

হাতের লেখাটা খুব পুরনো ছাঁদের। নতুন কালি দেখলেই বোঝা যায়, এ লেখাটা আজ বা কালকের। কিন্তু কখন লেখা হয়েছে, কে লিখল ? কাল রাতেও পাতাটা সাদা ছিল। নিলয়ের হাত পা শিরশির করতে থাকে। দম বন্ধ হয়ে আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাতার আদ্যোপান্ত পাতা উলটে যায়। না, আর কোথাও কিছু লেখা নেই। লেখাটা আর-একবার পড়ে নিলয়। খাতা বন্ধ করে আলমারিতে রাখে। অন্য খাতাগুলোয় হাত দিতে সাহস পায় না। একটু যেন শীত-শীত করছে। আলমারির পাল্লা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে যায় নিলয়। এ কী ! দরজা খুলছে না কেন ? চেষ্টা করে, কিন্তু দরজাটা কিছুতেই খোলে না। দারুণ ভয় পেয়ে দরজা ধাক্কাতে থাকে। খুলছে না কেন ? চিৎকার করে মা'কে ডাকতে গিয়েই নজরে পড়ে, ছিটকিনি বন্ধ। সে-ই তো বন্ধ করেছিল। এতক্ষণ বন্ধ দরজাটা নিয়েই টানাটানি করেছে। তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে প্রায় লাফিয়েই বাইরে চলে যায় নিলয়। ছুটে দোতলার সিঁড়ির দিকে যায়। বারান্দায় বসে প্রলয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছিল। একটা খাতায় মামাই কী যেন আঁকিবুকি করছে। মা উল বুনছেন। লুসি একপাশে চুপচাপ বসে। নিলয়কে দেখেই হঠাৎ ডাকতে শুরু করল। ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিলয়ের প্রায় গায়ে এসে পড়ে আর কি ! এক-একবার নিলয়ের দিকে চায়, আর ডাকতে ডাকতে নীচে ছুটে যায়। সিঁড়ির গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আবার ওপরে উঠে আসে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে নিলয়। সবাই তার দিকেই চেয়ে আছে। মামাই তো ভয় পেয়ে কাঁদতেই শুরু করল। বুঝতে পারে না নিলয়, এখন কী করা উচিত। লুসি এরকম করছে কেন ? সবার দৃষ্টি এড়াতে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। চুপচাপ বিছানায় শোয়। মা পাশে এসে দাঁড়ান।

"কী রে, কী হয়েছে বল তো ?"

কোনও উত্তর দেয় না নিলয়। মা কপালে হাত রাখেন, "তোর চোখ-মুখ লাল কেন রে ?"

কী বলবে ? মা'র দিকে চেয়ে পাশ ফিরে শোয় নিলয়। কপালে হাত রেখে মা বলেন,"কাল থেকেই দেখছি, কেমন করছিস। লুসিই বা তোকে দেখে ওরকম করছিল কেন ?"

মাথা তুলতে কষ্ট হলেও উঠে বসে নিলয়, "কিছুই হয়নি। যাও তো তুমি···" আবার শুয়ে পড়ে, "আলোটা নিভিয়ে দাও।" নিলয় জানলার দিকে মুখ করে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

রাতে একসময় ঘুম ভেঙে যায়। কী যেন স্বপ্ন দেখছিল। খুব হাসছিল ঘুমের মধ্যে। হাসতে-হাসতেই ঘুম ভেঙে গেল। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। কোথাও কিছু নেই, ওই খাতাগুলো দেখতে গিয়েই যত গণ্ডগোল। নিলয় আবার হাসতে থাকে। ব্যাপারটা বেশ মজার। পুরনো কয়েকটা খাতা নিয়ে কী কাণ্ড ! বন্ধুরা শুনলেও হাসাহাসি করবে। পাগল বলবে। আরও কত কিছু বলবে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়েই হাসতে থাকে নিলয়।

ওপাশ থেকে প্রলয় হঠাৎ ডাকে, "দাদা, এই দাদা···"

"কী রে, কী ব্যাপার ?"

খুব চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে প্রলয় বলে, "কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছিস ?"

"শব্দ ? কিসের শব্দ ?" বিছানায় উঠে বসল নিলয়, "কই, আমি তো কোনও শব্দ শুনিনি···"

বিছানা ছেড়ে ঘরের আলো জ্বালল প্রলয়। "মনে হল যেন নীচ থেকে একটা হাসির শব্দ আসছে, অদ্ভুত সে হাসি। একবার থামে, আবার হাসতে থাকে। কোনও মানুষ যে ওভাবে হাসে কী করে, জানি না···"

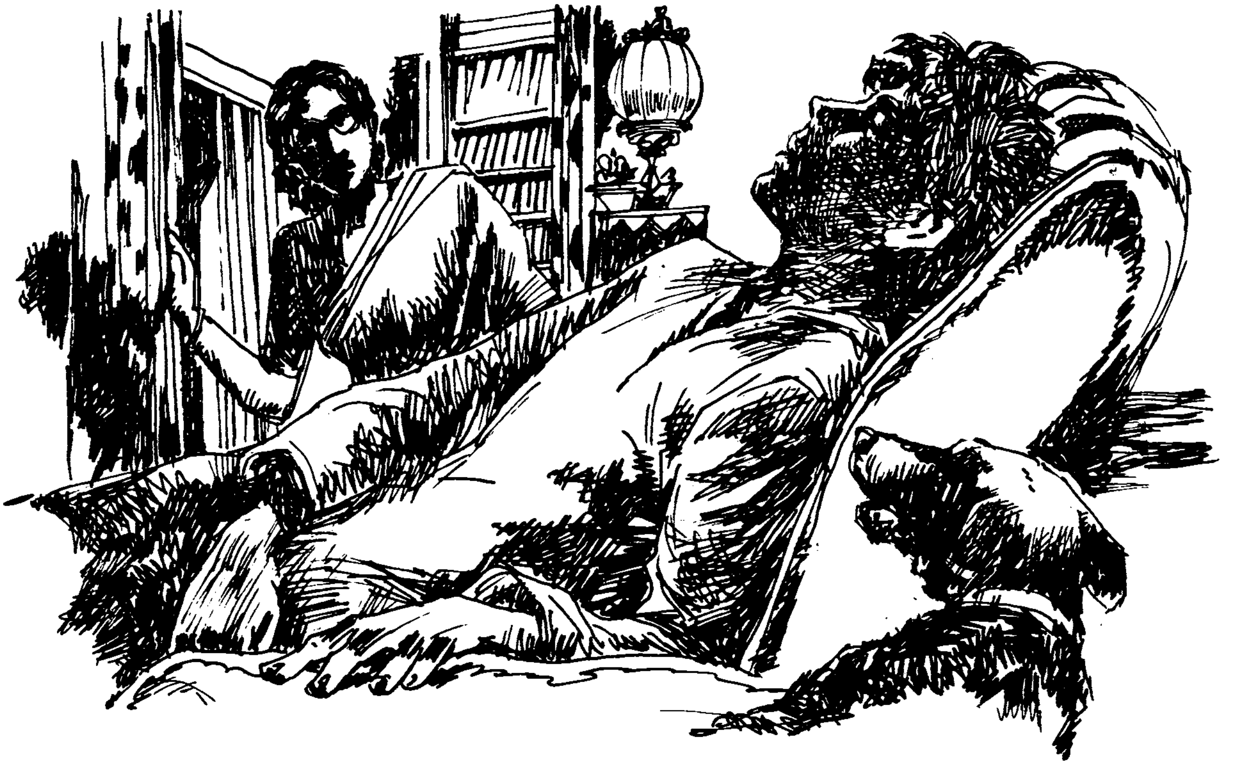

ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে থাকে নিলয় । কী বলবে ? হাসিটা যে তার, এটা কি ওকে এখন বলা যায় ? বললে, ও কি বিশ্বাস করবে ? খাটে বসে বসেই হাই তোলে নিলয়, "আলো নিভিয়ে শুয়ে পড় । হাসিটাসি তোর মনের ভুল । স্বপ্ন দেখিসনি তো ?"

উত্তর না দিয়ে, কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে প্রলয় । তারপর দরজা বন্ধ করে, ছিটকিনি দিয়ে দেয় । আলো নেভাতেই ঘর আবার অন্ধকার । নীচের রাস্তায় অনেকক্ষণ ধরেই কুকুর ডাকছিল । ডাকটা এ-বাড়ির সামনে এসে আরও যেন বেড়ে গেল । বাইরে অন্ধকার । রাস্তার মহানিমগাছটার পাতা হাওয়ায় কাঁপছে । সরসর শব্দ । একবার পেঁচা ডেকে উঠতেই কুকুরের ডাক হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল । আর কোনও শব্দ নেই ।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে, শেষ রাতের দিকে নিলয়ের ঘুম ভেঙে যায় । শুয়ে শুয়েই ঘাড় উঁচিয়ে দ্যাখে, প্রলয়ের তখনও নাক ডাকছে ।

উঠে বসে নিলয় । ঘুম ভাঙলেও, নেশার ভাবটা যায়নি । মাথা ভার । নিলয় দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল । নীচের ঘরে আলো জ্বলছে । সন্ধে থেকেই জ্বলছে নাকি ! সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নামে নিলয় । বাইরের ঘরের দরজা খোলা । পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগোয় নিলয় । লুসি কাছে কোথাও নেই তো ? এদিক-ওদিক দ্যাখে নিলয় । ডাইনিং টেবিলের নীচে উঁকি দেয় । না, নেই । নিশ্চয়ই ওপরে কোথাও আছে । ঘরে ঢুকেই কিন্তু চমকে ওঠে নিলয় । টেবিলে একটা লাল খাতা পড়ে আছে । খোলা । কেউ যেন এইমাত্র পাতা ওলটাচ্ছিল । নিলয় এগিয়ে গিয়ে খাতাটা তুলে নেয় । এটা দু'নম্বর খাতা । পাতা ওলটাতে-ওলটাতে এক জায়গায় থেমে যায় । লাল কালিতে স্পষ্ট লেখা, 'মনে রাখবে, যে তোমার বিরোধিতা করছে, সে তোমার শত্রু । শত্রুর শেষ রাখতে নেই ।' লেখাটা নিলয় বারবার পড়ল । কে শত্রু, কে-ই বা বিরোধিতা করছে, কিছুই বুঝতে পারে না ।

আলমারি খুলে খাতাটা আবার জায়গামতো রেখে দেয় । তিন আর চার নম্বর বের করে । তিনে কিছু লেখা নেই । কিন্তু চারের একেবারে শেষের পাতাটা দেখে আঁতকে ওঠে । নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না । এও কি সম্ভব ? লাল কালির অক্ষরগুলো চোখে ছুঁচ ফোটাচ্ছে । 'লুসিকে মেরে ফেলতে হবে । আলমারির বইয়ের পিছনে ইঁদুর-মারা বিষ আছে । কেউ যেন বুঝতে না পারে ।'

খাতাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নিলয় । তারপর খাতাটা আবার জায়গামতো রেখে, আলমারির পিছনে হাত দেয় । একটু হাতড়াতেই পলিথিনে-মোড়া ছোট একটা প্যাকেট পেয়ে যায় । অনেকদিন ধরে এখানে পড়ে আছে । এখন এটা ব্যবহার করলে কেউ বুঝতে পারবে না । কাজটা এমন কিছু কঠিন নয় । লুসিটা সত্যিই বড় জ্বালাচ্ছে । নীচের এই ঘরে ঢুকলে বা নীচ থেকে ওপরে গেলেই এমন ডাকতে শুরু করে যে, খুব অস্বস্তিতে পড়তে হয় । সন্ধের সময় কী কাণ্ডটাই না করল । ভয় পেয়ে মামাই তো কাঁদতে শুরু করেছিল । বিষের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে আলমারি বন্ধ করে নিলয় । আলো নিভিয়ে বাইরে চলে আসে । সাবধানে চারপাশটা দেখে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় । প্যাকেটটা কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে । সময়-সুযোগমতো কাজটা করা দরকার । যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব । নিলয় তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যায় ।

আজ লুসির যেন কী হয়েছে, সারাটা দিন নিলয়ের

কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে। মাঝে-মাঝে স্থির চোখে নিলয়কে দেখছে। ও কি কিছু বুঝতে পেরেছে ? পশুরা কথা বলতে পারে না, কিন্তু অনেক কিছুই বুঝতে পারে। তবে ও কিছু বুঝুক বা না-বুঝুক, যা করার করতে হবে। নিলয় সারাদিন ধরে সুযোগ খোঁজে। সন্ধের পর সবাই যখন ব্যস্ত, এক ফাঁকে নীচে নেমে যায়। সিঁড়ির গোড়ায় লুসির জন্যে রাখা জলের বাটিতে প্যাকেটের বিষ মিশিয়ে দেয়। কেমন যেন পাউরুটির গন্ধ। জলটা লুসি খাবে তো ? দেখা যাক।

যেন কিছুই হয়নি, এমন মুখের ভাব করে ধীরেসুস্থে ওপরে উঠে আসে নিলয়। লুসি বারান্দার এক কোণে বসে ছিল। নিলয়কে দেখেই, উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে শুরু করল। হাত নেড়ে ওকে কাছে ডাকে নিলয়। লুসি দূরে সরে যায়। প্রায় চার বছর আগে বাবা ওকে এনেছিলেন। সেই ছোট্ট লুসি আজ কত বড় হয়েছে। দু'দিন আগেও ওকে এভাবে মেরে ফেলার কথা ভাবতেই পারত না নিলয়। কিন্তু পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। বুঝতে পারে নিলয়, কে যেন তাকে দিয়ে এ-কাজ করিয়ে নিতে চাইছে, ইচ্ছে না-থাকলেও করার কিছু নেই।

ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে নিলয়। কেমন একটা চাপা উত্তেজনা ওকে অস্থির করে তুলছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি বিষ-মেশানো জল খেয়ে যন্ত্রণায় লুসি কাতরাতে শুরু করবে। বাড়িসুদ্ধু হুলুস্থুলু পড়ে যাবে। উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় নিলয়। একটু পরেই ছোট বোন মামাই আসে, "দাদাভাই, কী করছ ?"

"কিছু না, কেন বল তো ?"

"না এমনি," মামাই দাদার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, "তোমার কি শরীর খারাপ ? মা বলছিল..."

"কী বলছিল ?" নিলয় সোজা হয়ে বসে। মা কী বলেছেন, কে জানে।

দাদার হাত ধরে মামাই, "মা এখন তোমার কাছে আসতে বারণ করেছে।"

নিলয় চমকে ওঠে। মা যে কী বলেন, আর কী করেন, তার ঠিক নেই। কাছে আসতে বারণ করার কোনও মানে হয় ? ও কী ভাবছে, কে জানে ! লুসি কখন যেন ঘরে ঢুকেছিল। মামাই হঠাৎ ছুটে গিয়ে লুসিকে ধরতে গেল। লুসি এক লাফে একেবারে বাইরের বারান্দায়। মুখ কালো করে মামাই আবার দাদার কাছে আসে, "লুসি ভীষণ পাজি। দুপুরে আজ কী করেছে, জানো ?"

"কী রে," মামাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে নিলয়।

মামাই বলতে থাকে, দুপুরে সবাই তখন ঘুমিয়ে। এ-ঘরের দরজাও বন্ধ ছিল। লুসি পাশের ঘরের খাটের নীচে শুয়ে। হঠাৎ ডাকতে ডাকতে বাইরে ছুটে গেল। মামাইও ওর পিছন-পিছন গেল। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে, লুসি নখ আঁচড়াতে আঁচড়াতে গরগর শব্দ করতে থাকে। তারপর ছুটে নীচে নেমে যায়। মামাইও পিছু-পিছু যায়। লুসি বাইরের ঘরে ঢোকে। মামাইও যায়। লুসি এক অদ্ভুত কাণ্ড করতে থাকে। গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে সারা ঘরে ঘুরতে থাকে। মাঝে-মাঝে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে বইয়ের আলমারি আঁচড়ায়। ওর গলা দিয়ে তখন অদ্ভুত শব্দ বেরুচ্ছিল। মামাইকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় লুসি। তারপর ওকে প্রায় ঠেলেই বাইরে চলে যায়। একেবারে দোতলায়। এই পর্যন্ত বলে, মামাই দাদার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, "দাদাভাই, আমার না খুব ভয় করছিল..."

নিলয় বোনকে কাছে টেনে নেয়, "তুই কী করলি তখন ?"

মুখ নিচু করে মামাই চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "মাকে সব বলেছি।"

"মা কী বলল ?"

এদিক-ওদিক চেয়ে মামাই ফিসফিস করে, "কাউকে বলতে বারণ করেছে। তোমাকেও না," মামাই দরজার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়, "মা বলেছে, বাবা এখন বাড়ি নেই তো, লুসি তাই এরকম করছে..."

নিলয় চুপ করে থাকে। এরপর ওকে আর কী বলা যায় ? মা যা হোক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে নিলয়। মহানিমগাছের ডালপাতায় ডানা-ঝাপটানোর শব্দ। নীচের রাস্তা কাঁপিয়ে দারুণ শব্দে একটা ভারী ট্রাক ছুটে গেল। বাইরে কে যেন কাকে চিৎকার করে ডাকছে।

রাত দুটো নাগাদ নিলয়ের ঘুম ভেঙে গেল। মামাই পাশের ঘরে চিৎকার করছে। লুসিও ডাকছে। মা'র গলা শোনা যাচ্ছে। নিলয় উঠে বসে। দাদাকে উঠতে দেখে প্রলয় তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়। দু'ভাই প্রায় একসঙ্গেই ছুটে পাশের ঘরে যায়।

ঘরে ঢুকে দু'জনেই হতভম্ব। মামাইকে জড়িয়ে ধরে মা শান্ত করার চেষ্টা করছেন। মামাই হাত-পা ছুঁড়ে সমানে চিৎকার করছে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে লুসিও তারস্বরে ডাকছে।

কী ব্যাপার, ওরকম করছে কেন ? নিলয় ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

মা কী বললেন, লুসির চিৎকারে কিছুই শোনা গেল না। প্রলয় পিছন ফিরে লুসিকে কষে এক লাথি মারে। লুসি ছিটকে দরজার দিকে যায়। বারান্দায় গিয়ে ডাকতে থাকে। মামাই কিছুতেই থামতে চাইছে না। চিৎকার করেই যাচ্ছে। ছোটবোনকে কোলে নেয় নিলয়। বাইরের বারান্দায় যায়। কিন্তু কিছুতেই কান্না থামে না।

মা বলেন, "ঘরে এসে বোস না। মেয়েটার কী হল, কে জানে।"

মামাইকে নিয়ে নিলয় আবার মা'র কাছে আসে। লুসি ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। প্রলয় তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। মামাইকে নানাভাবে ভুলিয়ে যা জানা গেল, তা হচ্ছে, লুসি খাটের নীচেই শুয়ে ছিল। দরজা ছিল বন্ধ। ঘুমের মধ্যে মামাই যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, একটা বড় হাত নীচের ঘরের বইয়ের আলমারির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতটা তারপর আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। এই ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে দিল। একটু শব্দ হতেই মামাইয়ের ঘুম গেল ভেঙে। দরজাটা সত্যিই খোলা। ভীষণ শীত করছিল মামাইয়ের। মাকে ডাকতে যাবে, লুসি হঠাৎ গরগর করতে করতে বাইরে বেরিয়ে গেল। মামাইয়ের মনে হল, লুসির হয়তো বিপদ হতে পারে। প্রকাণ্ড হাতটা বোধহয় লুসিকে মেরে ফেলবে। এক্ষুনি ছুটে যাওয়া দরকার। মাকে আর ডাকেনি মামাই। তাড়াতাড়ি

খাট থেকে নেমে বাইরে ছুটেছিল। দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে লুসি তখন নখ আঁচড়াচ্ছে। মামাই কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নীচে ছুটল। মামাইও নামল। লুসি নীচে নেমে জলের বাটিটার গন্ধ শুঁকতে শুরু করল। মামাইয়ের মনে হল, বাটিতে এমন কিছু আছে যা খেলে লুসি আর বাঁচবে না। লুসির লেজটা ধরে পেছন দিকে টানতে শুরু করল মামাই। দু'একবার টানতেই, কে-যেন ওর মাথার চুল ধরে পিছন দিকে এক হ্যাঁচকা টান দিল। উলটে পড়ে মামাই। লুসি অন্যদিকে ছিট্‌কে যায়। ভীষণ ভয় পেয়ে মামাই চিৎকার করে ওঠে। প্রায় হুমড়ি খেতে খেতে ওপরে উঠে আসে।

কী আর বলে নিলয়। কেমন যেন অস্বস্তি হয়। জলে ইঁদুর-মারা বিষটা না মেশালেই হত। লুসি নিশ্চয়ই খায়নি। খেলে আর এক কাণ্ড হত। বাইরের বারান্দায় যায় নিলয়। পিছন-পিছন প্রলয় এগিয়ে আসে। "কোথায় যাচ্ছ?"

"কোথাও না," হাত নাড়ে নিলয়, "তুই এ-ঘরেই থাক। মা একা সামলাতে পারবে না।"

লুসি সামনেই শুয়ে ছিল। নিলয়কে দেখে উঠে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি নীচে নামে নিলয়। জলের বাটিও উলটে আছে। জলের রেখা গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকটা চলে গেছে, বাইরের ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত। ঘরটার দিকে চোখ পড়তেই গা শিরশির করে ওঠে। খাতাগুলোর জন্যই যত গণ্ডগোল। কেন যে ওগুলো দেখতে গেলাম! অন্ধকার ঘরটার দিকে চেয়ে থাকে নিলয়। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল নিলয়। ভেজানো দরজা একটু ঠেলতেই খুলে গেল। বাইরে থেকে আলো জ্বেলে ভেতরে ঢোকে নিলয়। চারটে খাতাই টেবিলে ছড়ানো। অন্য সময় হলে অবাক হত বা ভয় পেত। কারণ আজ একবারও আলমারির খাতা বের করেনি। টেবিলে ওগুলো ছড়ানো দেখে কিছুটা বিরক্ত হল নিলয়। পিছনে হঠাৎ খুট করে শব্দ হতেই, চমকে পেছন ফিরে তাকাল। লুসি দরজায় দাঁড়িয়ে। চোখ লাল। খুব রেগে গেছে। গরগর করছে না। নিঃশব্দে এদিকেই চেয়ে আছে। বাইরের রাস্তা দিয়ে জোরে হর্ন বাজিয়ে একটা গাড়ি ছুটে যেতেই হাত বাড়িয়ে একটা খাতা তুলে নেয় নিলয়। দ্রুত পাতা ওলটাতে থাকে। না, নতুন কিছু লেখা নেই। আগের মতোই আছে। বাকি খাতাও তাই। বেশ কিছুক্ষণ সব খাতারই পাতা উলটে যায় নিলয়। মাঝে-মাঝে দরজার দিকে চেয়ে দ্যাখে। লুসি একভাবেই দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দে দেখছে। এই খাতাগুলোর জন্যেই যত বিপত্তি। লুসিকে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা। মামাইয়ের ভয় পাওয়া। সে নিজেও প্রায় অসুস্থ। কয়েকদিন ধরেই বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না। কলেজ যাওয়াও হচ্ছে না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা নেই। বাড়ির সবাই সন্দেহের চোখে দেখছে। বাবা এসে কী বলবেন, কে জানে! খাতাগুলো এখনই দূর করে দিলে হয়।

হঠাৎ কেমন মাথা গরম হয়ে গেল নিলয়ের। চারটে খাতাই একসঙ্গে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালে লেগে খাতা ছিটকে গেল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। কে যেন খুব জোরে গলা চেপে ধরল। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। দারুণ শীত করছে। অনেক কষ্টে ওপাশের সোফায় গিয়ে বসল নিলয়। বসতে-না-বসতেই ঘুমে ঢলে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকে, "নিলু, এই নিলু।"

প্রথমটা ঘুম ভেঙে নিলয় কিছুই বুঝতে পারল না। সে তো দিব্যি তার খাটেই শুয়ে আছে। কিন্তু সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কেন? উঠে বসার চেষ্টা করে নিলয়, পারে না। মাথা ভার। গোটা শরীরটাই ব্যথা। কথা বলার চেষ্টা করল। গলা দিয়ে কোনও শব্দই বেরোল না। সব দেখতে পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। কান্না পায়। দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। কপালে বুকে হাত বোলাতে বোলাতে মা যা বলেন, তা হচ্ছে এই :

রাতে মামাই একটু ঠাণ্ডা হতেই, সবাই আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। নিলয় যে নীচে আছে, এটা কারও খেয়াল হয়নি। ভোরের দিকে লুসির ডাকে মা'র ঘুম ভেঙে যায়। কেমন যেন কান্নার মতো শব্দ করে লুসি ডাকছিল। মা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন। লাইব্রেরি-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লুসি ওরকম শব্দ করছিল। মা'র কেমন যেন খট্‌কা লাগল। মা'কে দেখে লুসি আরও জোরে ডাকাডাকি শুরু করল। ঘরে উঁকি দিয়েই মা চমকে ওঠেন। নিলয় হাত-পা ছড়িয়ে সোফার ওপর পড়ে ছিল। ঠাণ্ডা হাত-পা। খুব আস্তে নিশ্বাস পড়ছিল। মা ভয় পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন। তারপর যা হওয়ার তাই হয়েছে। প্রলয় ছুটে আসে। হৈচৈ শুনে পাশের বাড়ির লোকজনও এল। সবাই মিলে ধরাধরি করে নিলয়কে ওপরে নিয়ে গেল। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার অবশ্য পরীক্ষা করে কিছুই পেলেন না। বললেন, শরীর খুব দুর্বল। বেশ কয়েকদিন বিশ্রাম দরকার। তবে গলায় অস্পষ্ট আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কেউ বোধহয় খুব জোরে চেপে ধরেছিল।

নিলয়ের দিকে চেয়ে মা বলেন, "কী হয়েছিল বল তো? ও-ঘরে কেউ ছিল? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

চুপ করে থাকে নিলয়। দু'চোখ বেয়ে জল গড়ায়। মা বলেন, "ও-ঘরে তালা দিয়ে দিয়েছি। তোর বাবা এসে যা করার করবে..."

নিলয়ের চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

গ্যারিবল্ডির ঘরের জানালায় দুটি পাখি প্রায়ই এসে বসত। খেলা করত। মৃত্যুর আগে গ্যারিবল্ডি বলে গেলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা এই পাখি দুটিকে খেতে দিও।

◆

জারো আগা নামে এক ভদ্রলোক বোধহয় সবচেয়ে বেশিদিন বেঁচে ছিলেন। ইস্তাম্বুলের এক হাসপাতালে তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৬০ বছর।

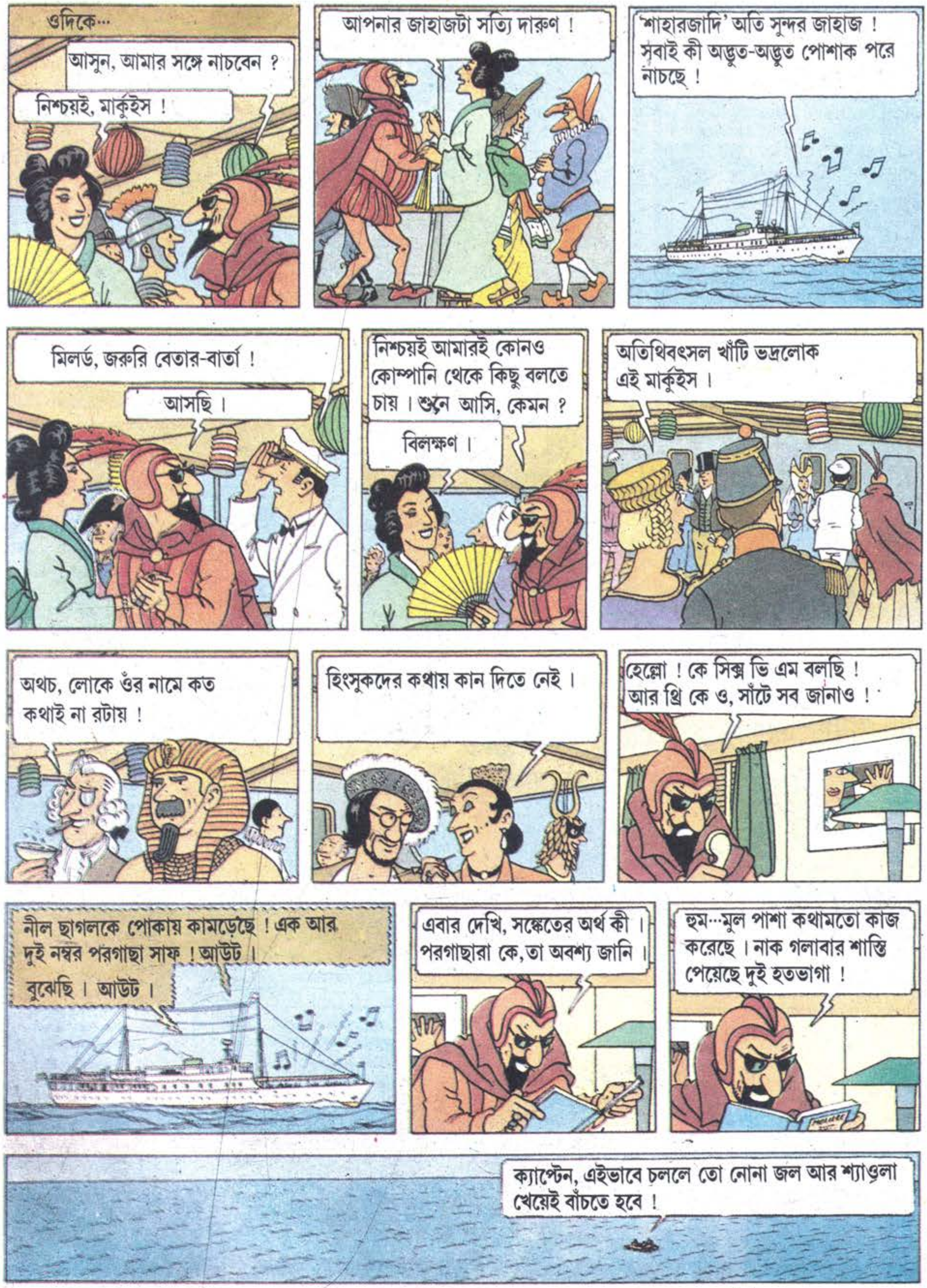
ওদিকে···
আসুন, আমার সঙ্গে নাচবেন ?
নিশ্চয়ই, মার্কুইস !
আপনার জাহাজটা সত্যি দারুণ !
'শাহারজাদি' অতি সুন্দর জাহাজ ! সবাই কী অদ্ভুত-অদ্ভুত পোশাক পরে নাচছে !
মিলর্ড, জরুরি বেতার-বার্তা !
আসছি ।
নিশ্চয়ই আমারই কোনও কোম্পানি থেকে কিছু বলতে চায় । শুনে আসি, কেমন ?
বিলক্ষণ ।
অতিথিবৎসল খাঁটি ভদ্রলোক এই মার্কুইস ।
অথচ, লোকে ওঁর নামে কত কথাই না রটায় !
হিংসুকদের কথায় কান দিতে নেই ।
হেল্লো ! কে সিক্স ভি এম বলছি ! আর থ্রি কে ও, সাঁটে সব জানাও !
নীল ছাগলকে পোকায় কামড়েছে ! এক আর দুই নম্বর পরগাছা সাফ ! আউট ।
বুঝেছি । আউট ।
এবার দেখি, সঙ্কেতের অর্থ কী । পরগাছারা কে, তা অবশ্য জানি ।
হুম···মুল পাশা কথামতো কাজ করেছে । নাক গলাবার শাস্তি পেয়েছে দুই হতভাগা !
ক্যাপ্টেন, এইভাবে চললে তো নোনা জল আর শ্যাওলা খেয়েই বাঁচতে হবে !

লোহিত সাগরের হাঙর

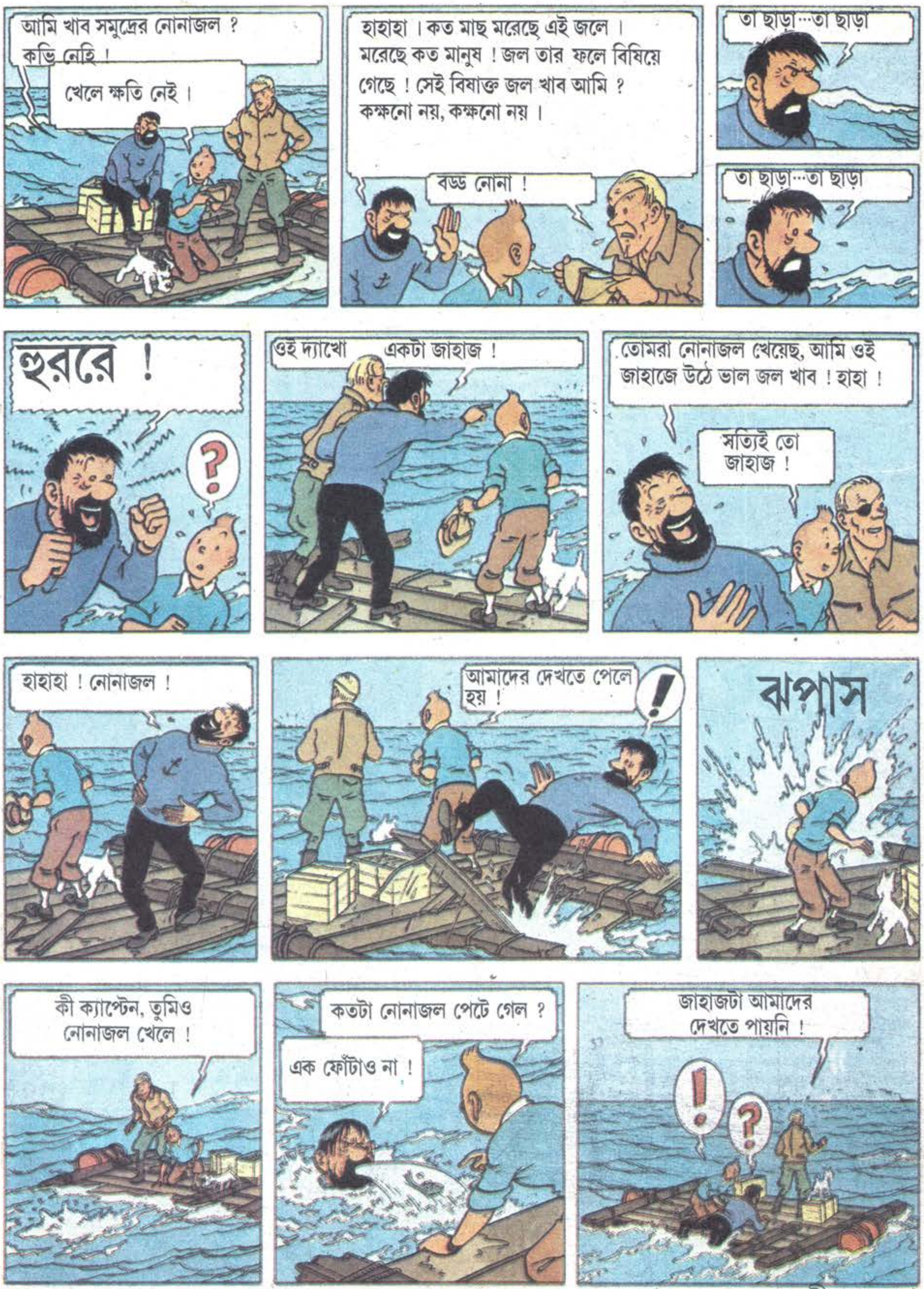
আমি খাব সমুদ্রের নোনাজল ? কভি নেহি !
খেলে ক্ষতি নেই ।
হাহাহা । কত মাছ মরেছে এই জলে । মরেছে কত মানুষ ! জল তার ফলে বিষিয়ে গেছে ! সেই বিষাক্ত জল খাব আমি ? কক্ষনো নয়, কক্ষনো নয় ।
বড্ড নোনা !
তা ছাড়া...তা ছাড়া
তা ছাড়া...তা ছাড়া
হুররে !
?
ওই দ্যাখো একটা জাহাজ !
তোমরা নোনাজল খেয়েছ, আমি ওই জাহাজে উঠে ভাল জল খাব ! হাহা !
সত্যিই তো জাহাজ !
হাহাহা ! নোনাজল !
আমাদের দেখতে পেলে হয় !
!
ঝপাস
কী ক্যাপ্টেন, তুমিও নোনাজল খেলে !
কতটা নোনাজল পেটে গেল ?
এক ফোঁটাও না !
জাহাজটা আমাদের দেখতে পায়নি !
!
?

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

মেলচেস্টার রোভার্স

অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! গোলের পরে গোল হচ্ছে !

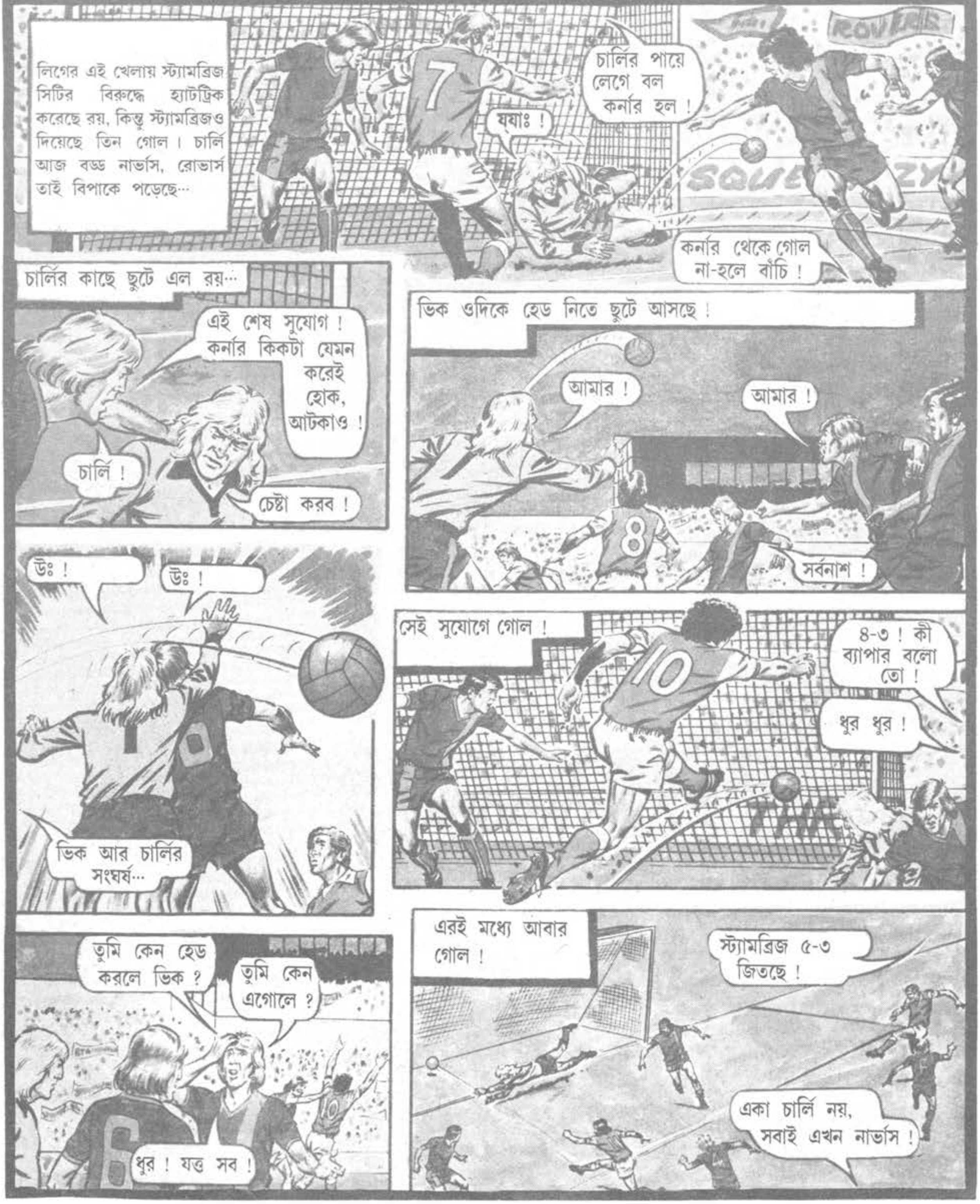
লিগের এই খেলায় স্ট্যামব্রিজ সিটির বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছে রয়, কিন্তু স্ট্যামব্রিজও দিয়েছে তিন গোল । চার্লি আজ বড্ড নার্ভাস, রোভার্স তাই বিপাকে পড়েছে…
চার্লির পায়ে লেগে বল কর্নার হল !
য্যাঃ !
কর্নার থেকে গোল না-হলে বাঁচি !
চার্লির কাছে ছুটে এল রয়…
এই শেষ সুযোগ ! কর্নার কিকটা যেমন করেই হোক, আটকাও !
চার্লি !
চেষ্টা করব !
ভিক ওদিকে হেড নিতে ছুটে আসছে !
আমার !
আমার !
সর্বনাশ !
উঃ !
উঃ !
ভিক আর চার্লির সংঘর্ষ…
সেই সুযোগে গোল !
৪-৩ ! কী ব্যাপার বলো তো !
ধুর ধুর !
তুমি কেন হেড করলে ভিক ?
তুমি কেন এগোলে ?
ধুর ! যত্ত সব !
এরই মধ্যে আবার গোল !
স্ট্যামব্রিজ ৫-৩ জিতছে !
একা চার্লি নয়, সবাই এখন নার্ভাস !

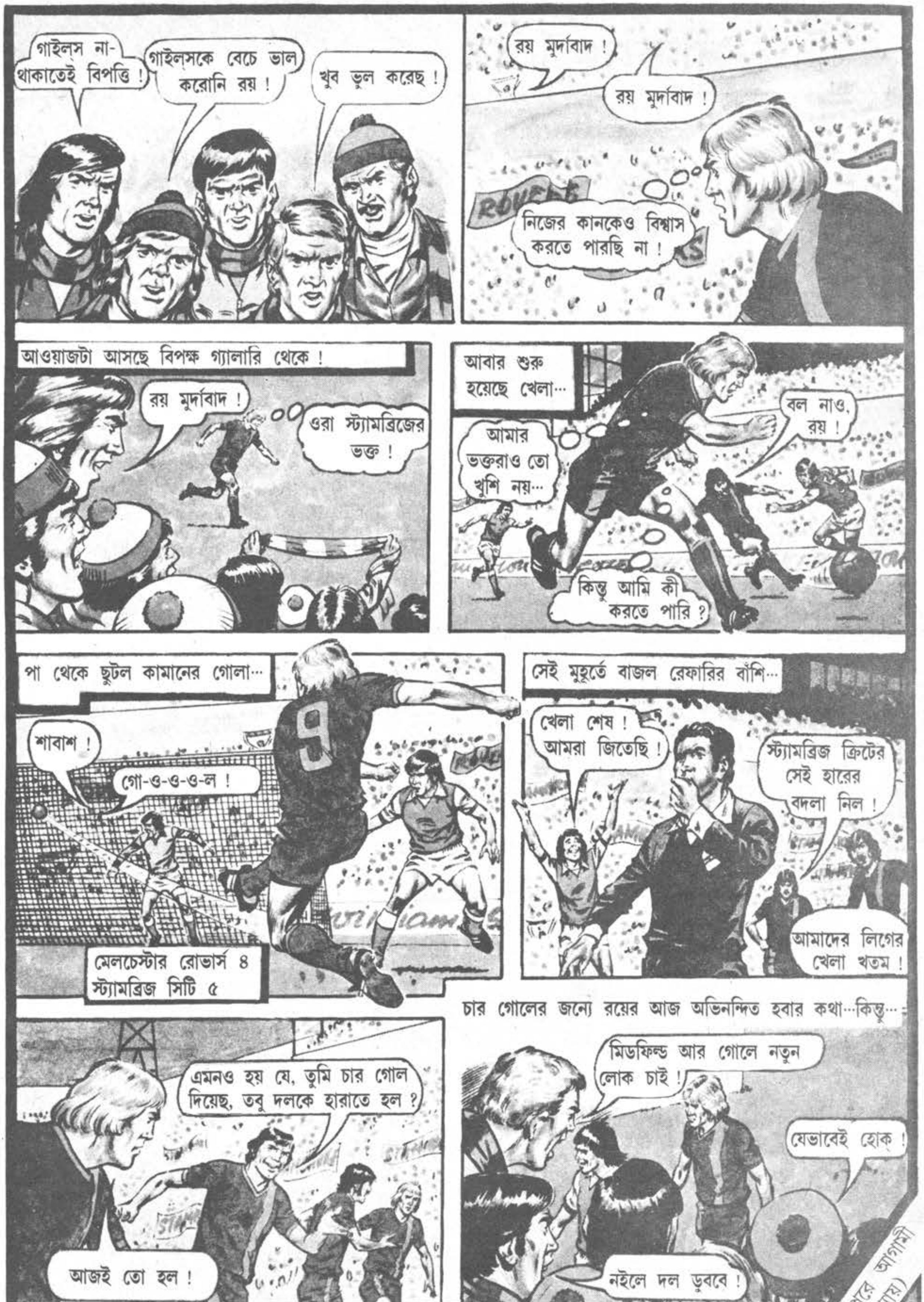
গাইল্‌স না-থাকাতেই বিপত্তি !
গাইল্‌সকে বেচে ভাল করোনি রয় !
খুব ভুল করেছ !
রয় মুর্দাবাদ !
রয় মুর্দাবাদ !
নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না !
আওয়াজটা আসছে বিপক্ষ গ্যালারি থেকে !
রয় মুর্দাবাদ !
ওরা স্ট্যামব্রিজের ভক্ত !
আবার শুরু হয়েছে খেলা···
আমার ভক্তরাও তো খুশি নয়···
বল নাও, রয় !
কিন্তু আমি কী করতে পারি ?
পা থেকে ছুটল কামানের গোলা···
শাবাশ !
গো-ও-ও-ও-ল !
মেলচেস্টার রোভার্স ৪ স্ট্যামব্রিজ সিটি ৫
সেই মুহূর্তে বাজল রেফারির বাঁশি···
খেলা শেষ ! আমরা জিতেছি !
স্ট্যামব্রিজ ক্রিটের সেই হারের বদলা নিল !
আমাদের লিগের খেলা খতম !
চার গোলের জন্যে রয়ের আজ অভিনন্দিত হবার কথা···কিন্তু···
এমনও হয় যে, তুমি চার গোল দিয়েছ, তবু দলকে হারাতে হল ?
আজই তো হল !
মিডফিল্ড আর গোলে নতুন লোক চাই !
যেভাবেই হোক !
নইলে দল ডুববে !

একজন গোলকিপারের দাম তিন কোটি টাকা ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ওস্তাদ-সাঁতারু গ্রিব

অনীশ ঘোষ

ডাঙার চেয়ে স্থলের যে-পাখির জল বেশি পছন্দ, নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো বা গাছের ডালপালায় বসে দোল খাওয়ার থেকে জলে সাঁতার কেটে সারা দিনমান কাটিয়ে দিতে বেশি আনন্দ যে পাখির, তার নাম গ্রিব । এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার জলাভূমি অঞ্চলে এদের বসবাস । এমনিতে এরা একা-একাই জলে সাঁতার কাটে, তবে বাসা বাঁধা বা ডিম পাড়ার সময় ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল অথবা সমুদ্রের উপকূলের দিকে চলে যায় ।

দেখতে অনেকটা হাঁসের মতো হলেও গ্রিবের গলা হাঁসের থেকে লম্বা, ঠোঁটও বেশ লম্বা ও সরু । তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, হাঁসের পায়ের আঙুলগুলি একটা পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া থাকে । তাতে সাঁতার কাটতে সুবিধে হয় । কিন্তু গ্রিবের সামনের দিকের তিনটি আঙুল আলাদা । তবে এদের পা দুটি দেহের তুলনায় অনেকটা পিছনে থাকায় জলের মধ্যে চলাফেরায় এরা দারুণ ক্ষিপ্র । বিপদের আশঙ্কা আছে বুঝলেই ডুব দিয়ে জলের নীচে অদৃশ্য হয়ে যায় । এমনকী শিকারির বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার সময় আগুনের যে ঝিলিক দেখা যায়, তা দেখেই এরা গুলি এড়িয়ে নিমেষে জলের নীচে ডুব দিয়ে আত্মরক্ষা করে । গ্রিব সাধারণত জলের বিশ ফিট নীচে পর্যন্ত ডুব দিয়ে যেতে পারে । ডুব দিয়ে জলের নীচে যাওয়ার সময় জলে কোনও আলোড়নও হয় না, শুধু ভারী জিনিসের মতো দেহটা ধীরে-ধীরে তলিয়ে যায় । এই অবস্থায় সাবমেরিনের পেরিস্কোপের মতো এরা শুধু জলের সমতায় মাথা, নাক আর চোখ দুটিকে জাগিয়ে রেখে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সাঁতার কেটে চলে যেতে পারে ।

সাঁতার কাটা বা ডুব দিয়ে উধাও হওয়ার ব্যাপারে ওস্তাদ হলে কী হবে,আকাশে ওড়ার সময় গ্রিব কিন্তু কিছুটা অসহায় । কেননা, এদের ডানা দুটি খুবই ছোট । বেশ খানিকক্ষণ ঘনঘন পাখা ঝাপটিয়ে অনেকটা দৌড়ে গিয়ে এরা শূন্যে উড়তে পারে ।

গ্রিবের গায়ের রঙ বিচিত্র । গলাটা লাল, মাথা নীলচে-সবুজ রঙের, আর থুতনির নীচের অংশ সাদা । দেহ ও পাখনার পালক উজ্জ্বল কালো, মনে হবে যেন তেল মেখে রয়েছে । এদের সাধারণ খাদ্য ছোট মাছ, জলজ কীটের ডিম, গুগলি, শামুক ইত্যাদি । পানকৌড়ির মতো ডুব দিয়ে এরা খাবার সংগ্রহ করে ।

অগভীর জলে ভাসমান নলখাগড়ার জঙ্গলে গ্রিব বাসা বানায় । তার ভেতরে তিন থেকে দশটি ডিম পাড়ে স্ত্রী-গ্রিব, আর ডিমে তা দেয় পুরুষ-গ্রিব । ২৮ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা হয় । বাচ্চারা বাবা-মা'র পিঠে চড়ে জলভ্রমণে বার হয় । এই সময় মা-বাবার পালকের নীচে শুধু মুখটি বার করে এরা বসে থাকে । বাচ্চাদের পিঠে নিয়ে বড়রা খাবার খুঁজে বেড়ায় । এইভাবে বেশ কয়েক সপ্তাহ বাবা-মা'র সঙ্গে ঘুরে জলের রাজ্য চিনে নিয়ে তবেই বাচ্চা-গ্রিব ডুব দিয়ে নিজেই খাবার ধরতে বার হয় ।

গ্রিবের আরও একটা অদ্ভুত স্বভাব হল নিজেদের দেহের পালক খাওয়া । শুধু বড়দেরই নয়, এমনকী বাচ্চা গ্রিবের পাকস্থলীতেও বড়দের পালক পাওয়া গেছে । এমনিতে পালকের কোনও খাদ্যগুণ না থাকলেও এরা যে পালক খায় তার পিছনে কিন্তু অন্য একটা কারণ আছে । এদের যে প্রধান খাদ্য মাছ, তার মধ্যে অনেক মাছেই থাকে বেশ কাঁটা । অথচ এদের পাকস্থলী এত নরম যে, সেখানে সহজেই ওই মাছের কাঁটা বিঁধে ক্ষত করতে পারে । এই কাঁটা যাতে পাকস্থলীতে খোঁচা না দেয় এবং পালকে আটকে গিয়ে ক্রমশ নরম হয়ে পড়ে, তার জন্যই এরা পালক খায় । অদ্ভুত না ?

এদের আর-একটা আশ্চর্য স্বভাব আছে । ডিম পাড়ার আগে এরা নিজেদের মধ্যে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে । কেউ বাঁশির মতো সরু মিষ্টি আওয়াজ করে, কেউ উচ্চস্বরে হুঙ্কার দেয়, কেউ আবার বিচিত্র ভঙ্গিতে জলের ওপর নাচতে শুরু করে, ডুব দিয়ে লুকোচুরি খেলে ।

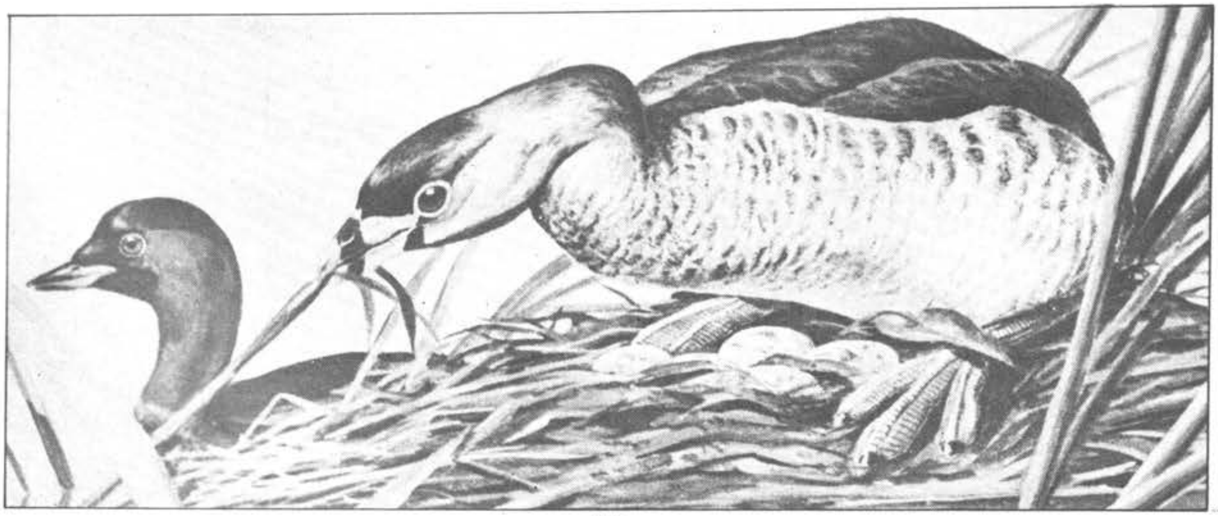

(বিজ্ঞাপন)

কুবের কুপোকাৎ

কাহিনী ও চিত্রনাট্য: চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

অঙ্কন : সঞ্জয় সাহা
একাদশ শ্রেণী

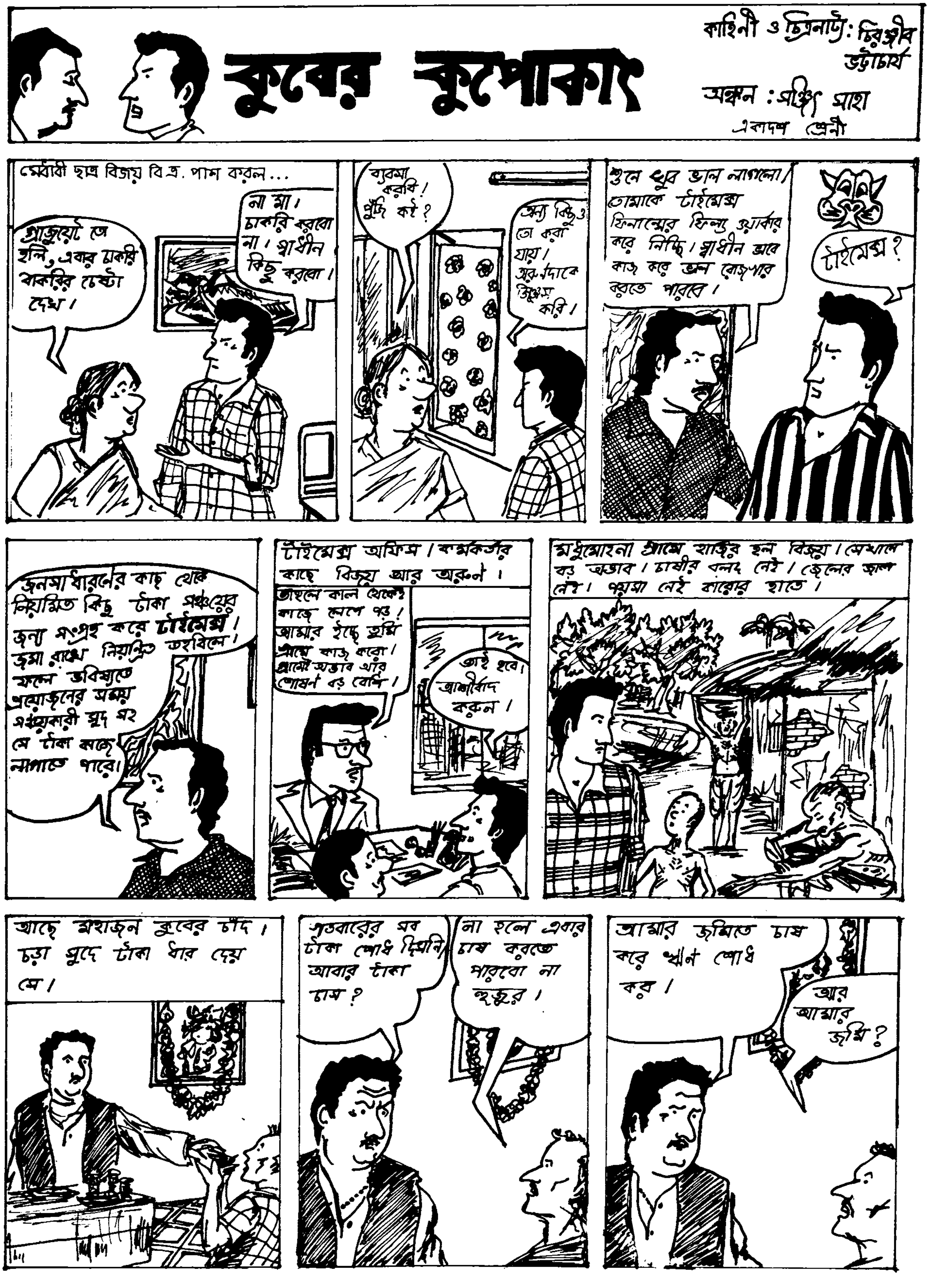
মেধাবী ছাত্র বিজয় বি.এ. পাশ করল...
গ্রাজুয়েট তো হলি, এবার চাকরি বাকরির চেষ্টা দেখ।
না মা। চাকরি করবো না। স্বাধীন কিছু করবো।
ব্যবসা করবি! পুঁজি কই?
অন্য কিছুও তো করা যায়। অরুণদাকে জিজ্ঞেস করি।
শুনে খুব ভাল লাগলো। তোমাকে টাইমেক্স ফিনান্সের ফিল্ড ওয়ার্কার করে নিচ্ছি। স্বাধীন ভাবে কাজ করে ভাল রোজগার করতে পারবে।
টাইমেক্স?
জনসাধারনের কাছ থেকে নিয়মিত কিছু টাকা সঞ্চয়ের জন্য সংগ্রহ করে টাইমেক্স। জমা রাখে নিয়ন্ত্রিত তহবিলে। ফলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় সঞ্চয়কারী সুদ সহ সে টাকা কাজে লাগাতে পারে।
টাইমেক্স অফিস। কর্মকর্তার কাছে বিজয় আর অরুণ।
তাহলে কাল থেকেই কাজে লেগে পড়। আমার ইচ্ছে তুমি গ্রামে কাজ করো। গ্রামেই অভাব আর শোষন বড় বেশি।
তাই হবে। আশীর্বাদ করুন।
মধুমোহনা গ্রামে হাজির হল বিজয়। সেখানে বড় অভাব। চাষীর বলদ নেই। জেলের জাল নেই। পয়সা নেই কারোর হাতে।
আছে মহাজন কুবের চাঁদ। চড়া সুদে টাকা ধার দেয় সে।
গতবারের সব টাকা শোধ দিসনি, আবার টাকা চাস?
না হলে এবার চাষ করতে পারবো না হুজুর।
আমার জমিতে চাষ করে ঋণ শোধ কর।
আর আমার জমি?

(বিজ্ঞাপন)

কুবের কুপোকাৎ

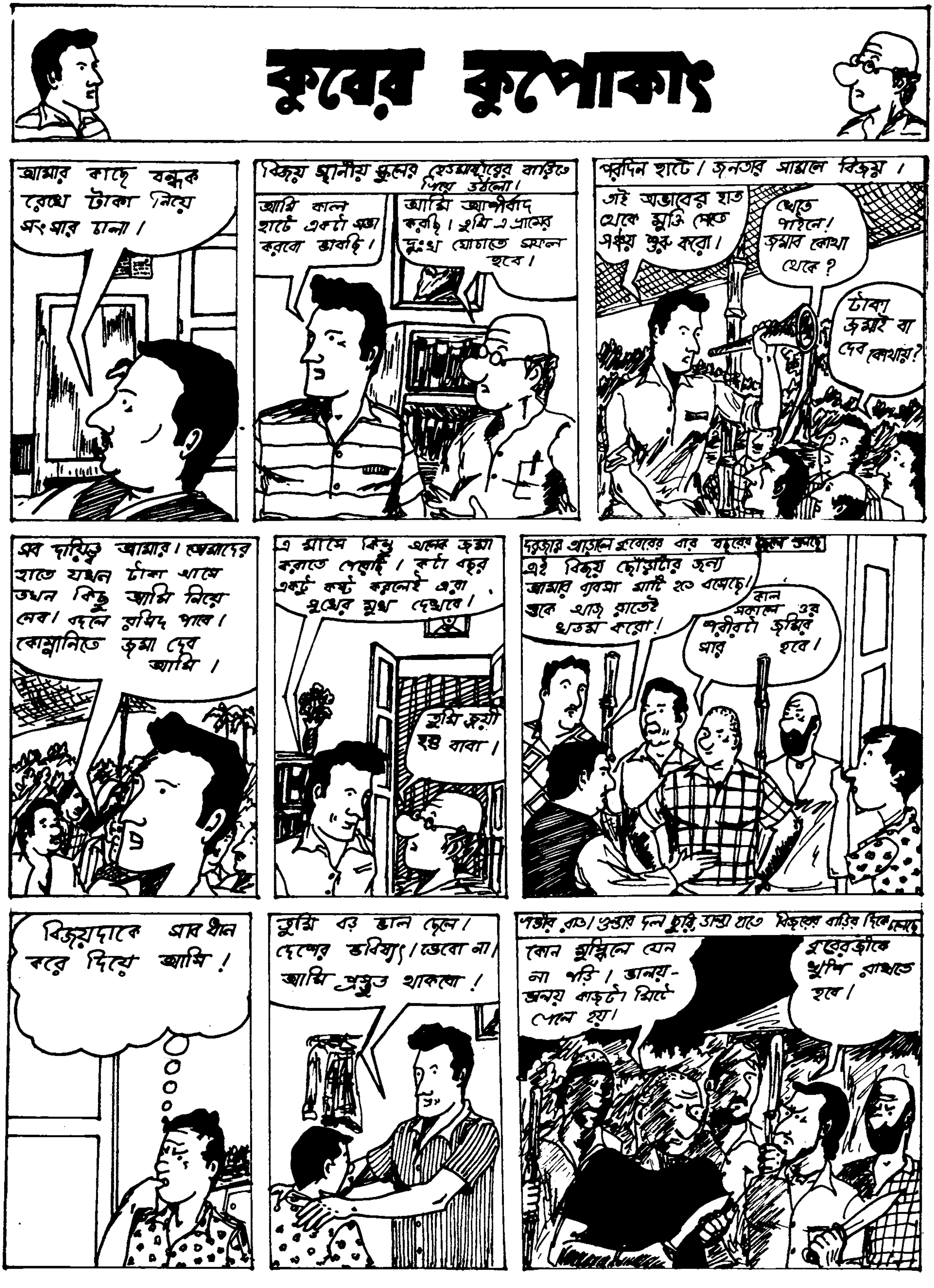
আমার কাছে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে সংসার চালা।
বিজয় স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টারের বাড়িতে গিয়ে উঠলো।
আমি কাল হাটে একটা সভা করবো ভাবছি।
আমি আশীর্বাদ করছি। তুমি এ গ্রামের দুঃখ ঘোচাতে সফল হবে।
পরদিন হাটে। জনতার সামনে বিজয়।
এই অভাবের হাত থেকে মুক্তি পেতে সঞ্চয় শুরু করো।
খেতে পাইনে! জমাব কোথা থেকে?
টাকা জমাই বা দেব কোথায়?
সব দায়িত্ব আমার। তোমাদের হাতে যখন টাকা আসে তখন কিছু আমি নিয়ে নেব। বদলে রসিদ পাবে। কোম্পানিতে জমা দেব আমি।
এ মাসে কিছু এদের জমা করাতে পেরেছি। কটা বছর একটু কষ্ট করলেই এরা সুখের মুখ দেখবে।
তুমি জয়ী হও বাবা।
দরজার আড়ালে কুবেরের বার বছরের ছেলে অপু।
এই বিজয় ছোঁড়াটার জন্য আমার ব্যবসা মাটি হতে বসেছে। ওকে আজ রাতেই খতম করো!
কাল সকালে ওর শরীরটা জমির সার হবে।
বিজয়দাকে সাবধান করে দিয়ে আমি!
তুমি বড় ভাল ছেলে। দেশের ভবিষ্যৎ। ভেবো না। আমি প্রস্তুত থাকবো!
গভীর রাত। গুন্ডার দল ছুরি, ডান্ডা হাতে বিজয়ের বাড়ির দিকে চলেছে।
কোন মুস্কিলে যেন না পড়ি। ভালয়-ভালয় কাজটা মিটে গেলে হয়।
কুবেরদাকে খুশি রাখতে হবে।

(বিজ্ঞাপন)

কুবের কুপোকাৎ

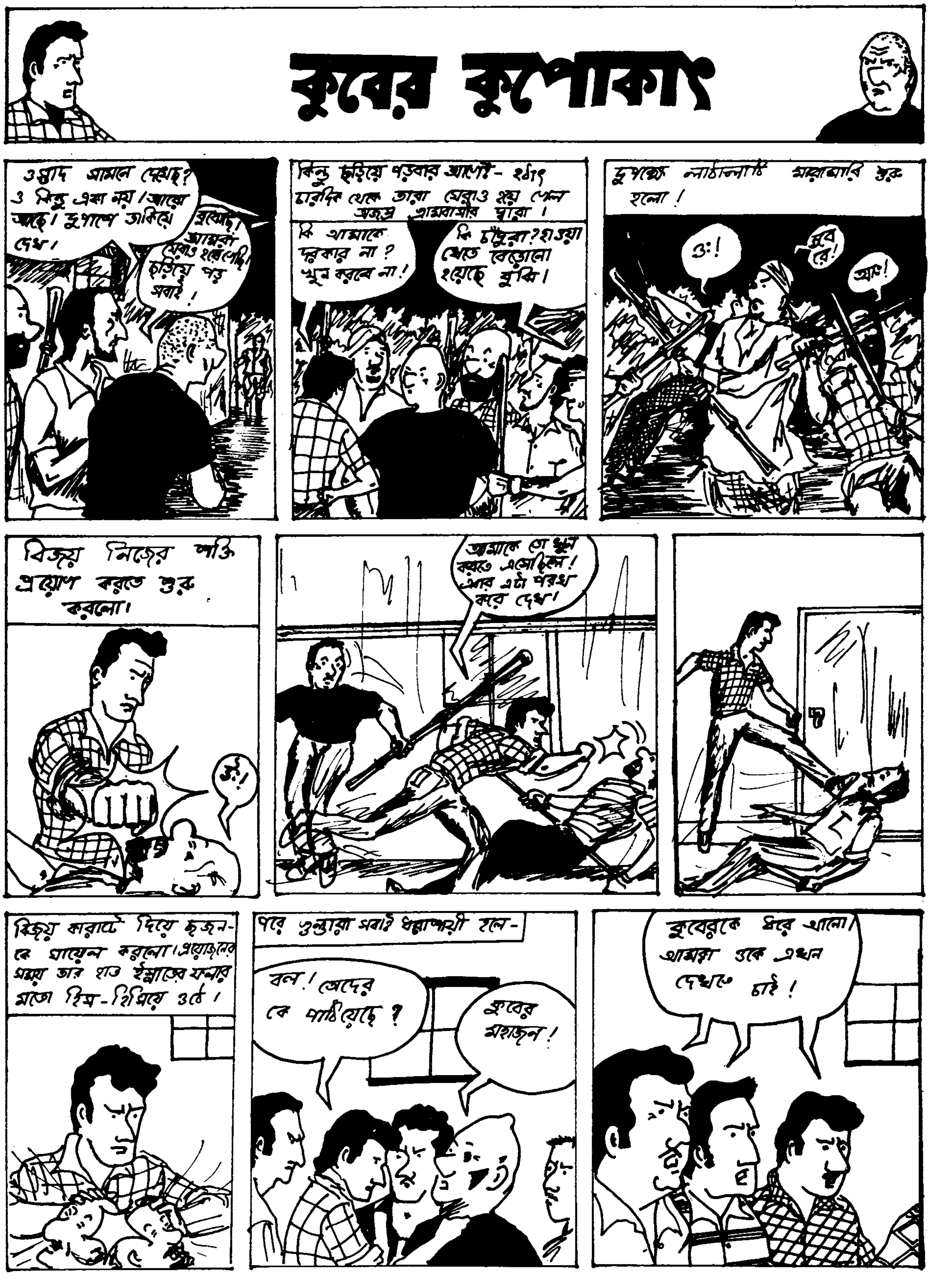
ওস্তাদ সামনে দেখেছ? ও কিন্তু একা নয়। আরো আছে। দুপাশে তাকিয়ে দেখ।
বুঝেছি! আমরা ঘেরাও হয়েছি। ছড়িয়ে পড় সবাই!
কিন্তু ছড়িয়ে পড়বার আগেই- হঠাৎ চারদিক থেকে তারা ঘেরাও হয়ে গেল অজস্র গ্রামবাসীর দ্বারা।
কি আমাকে দরকার না? খুন করবে না!
কি চাঁদুরা? হাওয়া খেতে বেড়োনো হয়েছে বুঝি।
দুপক্ষে লাঠালাঠি মারামারি শুরু হলো!
ওঃ!
মরে রে!
আঃ!
বিজয় নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করলো।
উঃ!
আমাকে তো খুন করতে এসেছিলে! আর এটা পরখ করে দেখ।
বিজয় কারাটে দিয়ে ছজন-কে ঘায়েল করলো। প্রয়োজনের সময় তার হাত ইস্পাতের ফলার মতো হিস-হিসিয়ে ওঠে।
পরে গুণ্ডারা সবাই ধরাশায়ী হলে-
বল! এদের কে পাঠিয়েছে?
কুবের মহাজন!
কুবেরকে ধরে আনো। আমরা ওকে এখন দেখতে চাই!

(বিজ্ঞাপন)

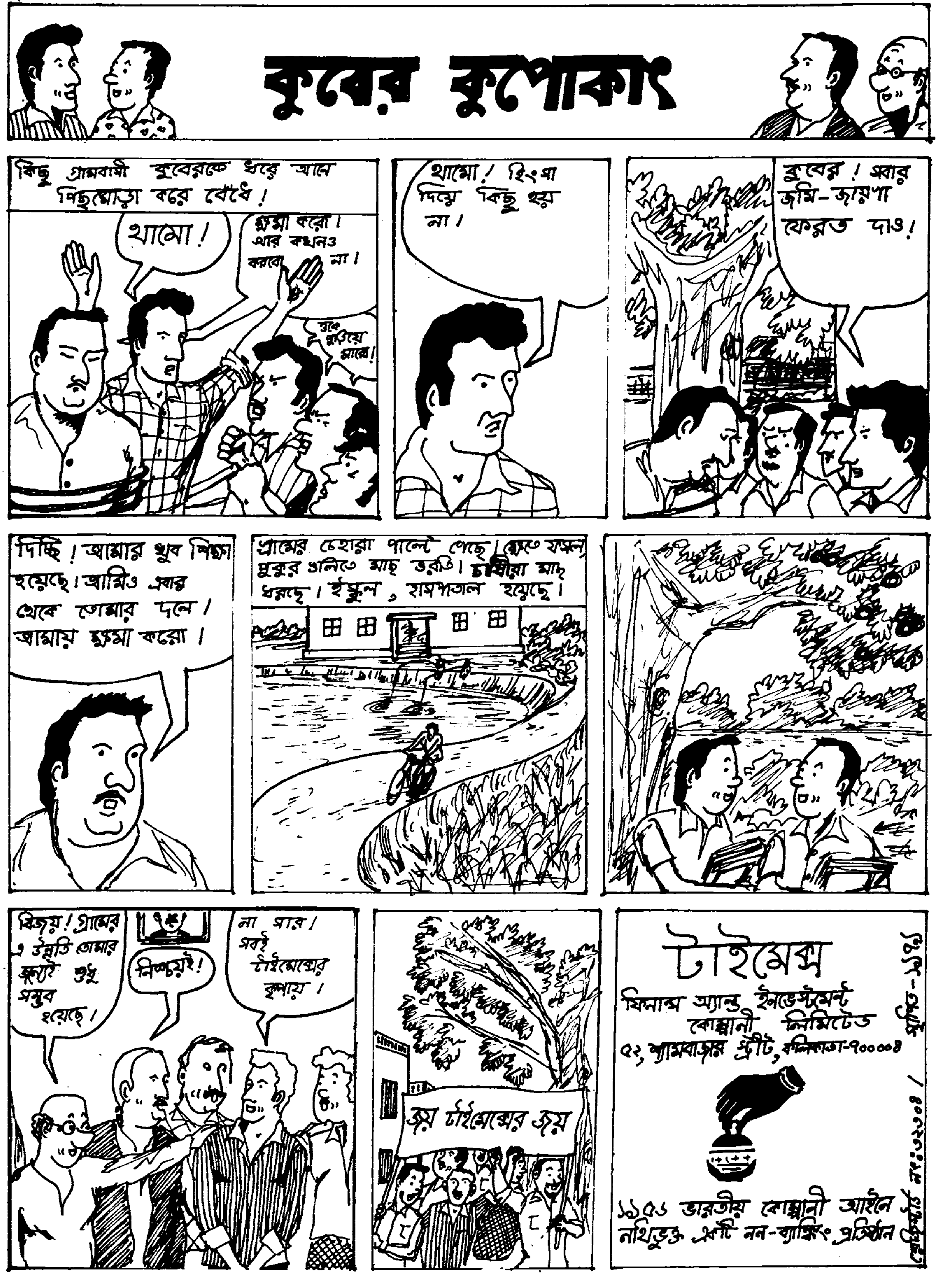
কুবের কুপোকাৎ
কিছু গ্রামবাসী কুবেরকে ধরে আনে পিছমোড়া করে বেঁধে!
থামো!
ক্ষমা করো! আর কখনও করবো না।
বুকে গুঁড়িয়ে মারো!
থামো! হিংসা দিয়ে কিছু হয় না।
কুবের! সবার জমি-জায়গা ফেরত দাও!
দিচ্ছি! আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। আমিও এবার থেকে তোমার দলে। আমায় ক্ষমা করো।
গ্রামের চেহারা পাল্টে গেছে। ক্ষেতে ফসল, পুকুর গুলিতে মাছ ভরতি। চাষীরা মাছ ধরছে। ইস্কুল, হাসপাতাল হয়েছে।
বিজয়! গ্রামের এ উন্নতি তোমার জন্যেই শুধু সম্ভব হয়েছে।
নিশ্চয়ই!
না স্যার! সবই টাইমেক্সের কৃপায়।
জয় টাইমেক্সের জয়
টাইমেক্স
ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
৫২, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪
১৯৫৬ ভারতীয় কোম্পানী আইনে নথিভুক্ত একটি নন-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান
রেজিস্টার্ড নং: ৩২৩০৪ / স্থাপিত - ১৯৭৬

সীমা ছাড়ানোর মজা

সুজন দাশগুপ্ত

বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক জেনো'র প্যারাডক্সটা নিশ্চয় তোমাদের অনেকেরই জানা। জেনো প্রমাণ করেছিলেন যে, আকিলেসের মতো দক্ষ ক্রীড়াবিদও পিছন থেকে দৌড়ে একটা কচ্ছপকে ধরতে পারবেন না। তাঁর প্রমাণটা ছিল এই রকম। ধরা যাক, প্রথমে কচ্ছপটা ছিল ক-১ বিন্দুতে। আকিলেস যখন দৌড়ে এসে ক-১ বিন্দুতে পৌঁছবেন, সেই সময় কচ্ছপটা ক-২ বিন্দুতে চলে যাবে। ক-১ থেকে ক-২ বিন্দুতে পৌঁছতে আকিলেসের আবার কিছুটা সময় লাগবে, সেই সময়টুকুতে কচ্ছপটা ক-৩ বিন্দুতে চলে যাবে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি অসংখ্যবার ধরে চলবে। অতএব, আকিলেস কখনই কচ্ছপকে ধরতে পারবেন না।

জেনো'র যুক্তির ফাঁকটা, অঙ্কে যাদের অসীম-শ্রেণীর সঙ্গে পরিচয় আছে তারা সবাই ধরতে পারবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, আকিলেসের ক-১ বিন্দুতে পৌঁছতে তার থেকে কম সময় লাগবে, ক-২ থেকে ক-৩ বিন্দুতে পৌঁছতে আরও কম লাগবে ইত্যাদি। এই সময়ের খণ্ডগুলোকে যদি একসঙ্গে যোগ করা হয়, যদিও সংখ্যায় তারা অসীম হবে, কিন্তু তাদের যোগফল হবে সসীম। অর্থাৎ আকিলেস অবশ্যই কচ্ছপকে ধরতে পারবেন।

অসীম-শ্রেণীর যোগফল যে সসীম হতে পারে সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় লাঠিভাঙার উদাহরণটা নিলে। একটা ১ ফুট লম্বা লাঠিকে নিয়ে প্রথমে সমান দু' ভাগ করা হল। এবার তার থেকে একটা $^{১}/_{২}$ ফুট টুকরো নিয়ে, সেটাকে অর্ধেক করে দুটো $^{১}/_{৪}$ ফুট টুকরো পাওয়া গেল। সেখান থেকে আবার একটা টুকরো তুলে তাকে অর্ধেক ($^{১}/_{৮}$ ফুট) করা হল। এইভাবে প্রত্যেকবার অর্ধেক করার পর, তার থেকে একটা টুকরো তুলে সেটাকে আবার অর্ধেক করতে হবে। এটা বহুবার করা যেতে পারে। এখন যদি এই অসীম-সংখ্যক টুকরোগুলোকে জোড়া লাগানো যায়, তা হলে অঙ্কের ভাষায় লেখা যাবে :

$$^{১}/_{২} + ^{১}/_{৪} + ^{১}/_{৮} + ^{১}/_{১৬} + \cdots\cdots$$

এই অসীম-শ্রেণীর যোগফল অবশ্যই ১ হতে হবে, কারণ আমরা ১ ফুট লাঠি নিয়ে ভাঙাটা শুরু করেছিলাম।

তোমরা যারা অসীম-শ্রেণীর রহস্যটা জানো, তারা নিশ্চয় এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছ। ভাবছ, এ নিয়ে এত মাতামাতি করার কী আছে! বেশ, এবার তা হলে কল্পনা করো একটা অদ্ভুত ধরনের টেবিলল্যাম্প। এই টেবিলল্যাম্পে একটা টাইমার লাগানো আছে, যার জন্য টেবিলল্যাম্পটা $^{১}/_{২}$ মিনিটের জন্য জ্বলে, পরের $^{১}/_{৪}$ মিনিট নিভে থাকে, তার পরের $^{১}/_{৮}$ মিনিট জ্বলে, আবার $^{১}/_{১৬}$ মিনিট নিভে থাকে ইত্যাদি। ঠিক ওপরের ওই অসীম-শ্রেণীটার মতো। তাই যদি হয়, তা হলে এই জ্বলা-নেভাটা এক মিনিটের মধ্যেই শেষ হতে হবে, কারণ ওপরের ওই অসীম-শ্রেণীর যোগফল হচ্ছে মাত্র ১। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এক মিনিট বাদে বাতিটা জ্বলে থাকবে, না নিভে থাকবে? কেউ হয়তো উত্তরে বলবে, নিভে থাকবে।

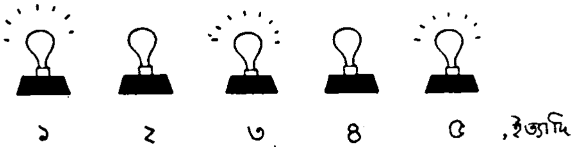

২নং ছবি

কেন?

বাঃ, অতবার জ্বললে-নিভলে বাতি ফিউজ হবে না!

উত্তরটা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত বাস্তবের বিচারে। কিন্তু ধরা যাক, এই বাল্‌বটা ফিউজ হবার নয়, বহুবার এটাকে জ্বালানো-নেভানো চলবে। তা হলে উত্তরটা কী হবে?

যারা প্রবাবিলিটি সম্পর্কে কিছুটা জানো তারা বলবে, জোর করে কিছুই বলা যায় না, কারণ জ্বলে-থাকা বা নিভে-থাকা, দুটোর সম্ভাবনাই সমান সমান। অতএব, ফিফটি পার্সেন্ট চান্স জ্বলে থাকবে (অথবা, ফিফটি পার্সেন্ট চান্স নিভে থাকবে)। মুশকিল হল, এই ধরনের বিচারে একটা ঘোরতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। একটু চিন্তা করলেই তোমরা সেটা ধরতে পারবে। ধরা যাক টাইমারের প্রথম সুইচ টেপাতে বাতিটা জ্বলল, দ্বিতীয়বার টেপাতে নিভল, তৃতীয়বারে আবার জ্বলল ইত্যাদি। এইভাবে অসংখ্যবার চলবে। অর্থাৎ প্রতি বিজোড় সংখ্যক সুইচ টেপাতে বাতিটা জ্বলছে, আর জোড় সংখ্যায় নিভছে। এখন এক মিনিট বাদে এইভাবে অসীমবার সুইচ টেপার পর বাতিটা যদি জ্বলে বা নিভে থাকে, তা হলে প্রমাণ হবে যে অসীম সংখ্যার একটা শেষ আছে এবং সেটা হয় জোড় অথবা বিজোড়। মুশকিল হল, অসীম সংখ্যার কোনও শেষ নেই, সুতরাং জোড়-বিজোড়ের প্রশ্ন ওঠে না। অতএব এই ল্যাম্প জ্বলে কিংবা নিভে কোনওভাবেই থাকতে পারে না। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব! বাতি জ্বলা বা নেভা ছাড়া আর কীভাবে থাকতে পারে? এর উত্তর আমার জানা নেই। বলতে কী, এই প্যারাডক্সের রহস্যটাকে বড় বড় বিজ্ঞানীরাও পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারেননি। সমস্যাটা প্রথম উত্থাপন করেছিলেন

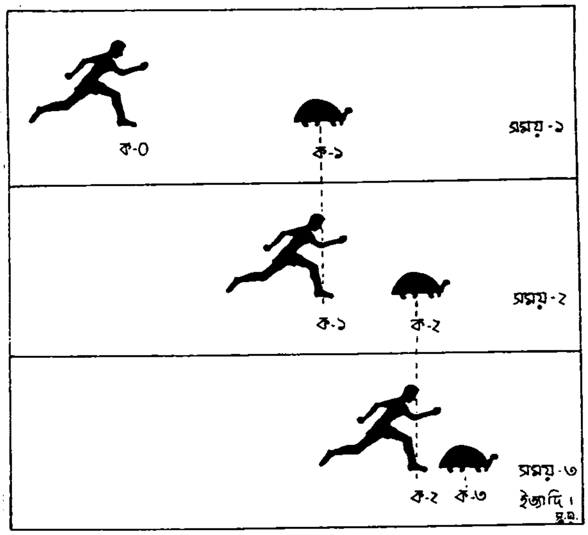

১ নং ছবি

জেমস টম্পসন। সেই জন্য এটাকে বলা হয় 'টম্পসন ল্যাম্প'। অবশ্যই এই ধরনের ল্যাম্প বাস্তব জগতে বানানো অসম্ভব। কিন্তু যেটা সবচেয়ে অস্বস্তিকর সেটা হল, যদি অসীম-সংখ্যক লাঠির খণ্ড জুড়ে এক ফুট লাঠির সৃষ্টি হয়, তা হলে সেই রকম অসীম-সংখ্যক সময়ের খণ্ড জুড়ে এক মিনিটের মধ্যে জ্বলা-নেভা শেষ হওয়ার মধ্যে অসুবিধেটা কোথায় ?

আসলে, অসীমকে নিয়ে চিন্তা করতে গেলেই নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিখ্যাত গণিতবিদ ভন নিউম্যানের গল্পটাই ধরা যাক। ভন নিউম্যানকে নাকি তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, দুটো ট্রেন সেকেণ্ডে ৫০ ফুট গতিতে, ১০০ ফুট দূর থেকে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে। একটা মৌমাছি সেকেণ্ডে ৭৫ ফুট বেগে 'ক' ট্রেনের (২ নং ছবি) সামনে থেকে উড়ে 'খ' ট্রেনের সামনে যাচ্ছে, আবার এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ফিরে আসছে। এইভাবে অনেকক্ষণ উড়ে শেষ পর্যন্ত ট্রেনের মাঝখানে পড়ে মৌমাছিটা চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে মারা গেল। প্রশ্ন হল, মৌমাছি কতটা পথ উড়েছিল ? প্রশ্নটার উত্তর দিতে ভন নিউম্যানের মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লেগেছিল। বন্ধু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি ভন নিউম্যান উত্তরটা বার করলেন কী করে ? ভন নিউম্যান জবাব দিয়েছিলেন যে, মরার আগে পর্যন্ত মৌমাছিটা অসংখ্যবার একটা ট্রেন থেকে আর-একটা ট্রেনে উড়েছিল। তিনি ওই অসীম-শ্রেণীটিকেই মনে মনে যোগ করেছেন।

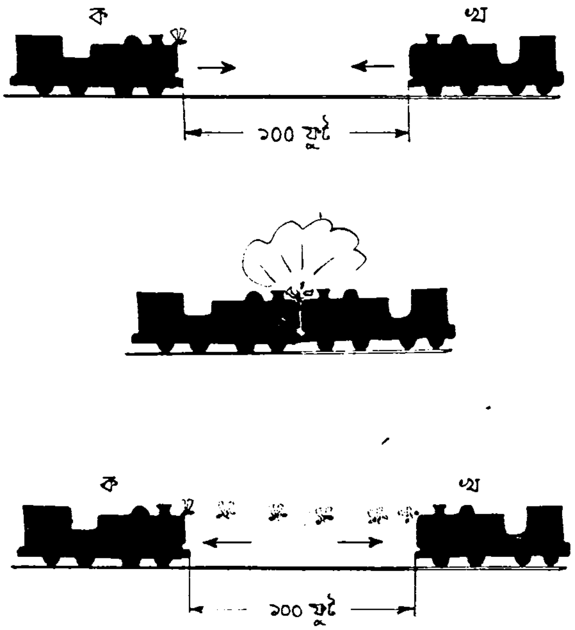

৩ নং ছবি

গল্পটা কতদূর সত্যি বলা শক্ত। তবে এ-কথা ঠিক যে, দ্রুত হিসেব করার ব্যাপারে ভন নিউম্যানের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এক্ষেত্রে অত হিসেবের অবশ্য কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ ট্রেন দুটো ধাক্কা খেতে যেটুকু সময় লাগবে, শুধু সেই সময়টুকু মৌমাছি উড়তে পেরেছিল। সেটা বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। যাই হোক, এখানে এই গল্পটার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কিন্তু ভন নিউম্যানের হিসেবের দোষ-বিচার বা গুণকীর্তন করা নয়। উদ্দেশ্য হল, সমস্যাটাকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করা। ধরা যাক, উলটো দিকে সিনেমা চালানোর মতো সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে আমরা ঘুরিয়ে দিলাম। অর্থাৎ মৌমাছির চিঁড়েচ্যাপ্টা অবস্থা থেকে ঘটনাটার শুরু। ট্রেন দুটো পরস্পরের থেকে সরে তখন উলটো দিকে একই গতিতে চলছে। মৌমাছিও কোনও মৃতসঞ্জীবনী সুধার দৌলতে নবজীবন লাভ করে দুই ট্রেনের মাঝে আগের মতো ওড়াউড়ি শুরু করেছে। এইবার প্রশ্ন হল, যখন ট্রেন দুটো পরস্পরের থেকে ১০০ ফুট দূরে পৌঁছবে, তখন মৌমাছিটা কোথায় থাকবে ? তোমরা বলবে, এটা আবার একটা প্রশ্ন হল নাকি ! নিশ্চয় মৌমাছি 'ক' ট্রেনে থাকবে, সেখান থেকেই সে প্রথমবার ওড়া শুরু করেছিল। কিন্তু তা নয়। আসল উত্তর হল, মৌমাছি যে-কোনও জায়গাতেই থাকতে পারে, 'ক' ট্রেনে, 'খ' ট্রেনে, অথবা 'ক' ও 'খ' ট্রেনের মাঝামাঝি কোথাও। কেন ? উত্তরটা তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে বার করতে পারবে। এর আগের প্রশ্নে মৌমাছি প্রথমে কোথায় ছিল, তার সঙ্গে সে কতটা উড়েছিল, তার কোনও সম্পর্কই নেই। সে যেখান থেকেই ওড়া শুরু করুক না কেন, বহুবার দুটো ট্রেনের মধ্যে যাতায়াত করে ১ সেকেণ্ড পরে সে ট্রেন দুটোর চাপে ইহলোক ত্যাগ করত। এটা বিচার করলেই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকে না।

মৌমাছির মৃত্যুর জন্য শোক না করে এবার ভাগ্যবান অসীমকুমারের কথা একটু ভাবা যাক। কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবরের পাশে অসীমকুমার যে হোটেলটা খুলেছে, তাতে ঘরের কোনও সীমা-সংখ্যা নেই, অর্থাৎ অসীম। আর কপালগুণে তার সমস্ত ঘরই পুজোর ছুটিতে ভর্তি। এমন সময় দিল্লি থেকে হঠাৎ এক ভি· আই· পি· এসে হাজির। কোথায় তাঁকে রাখা যায় ? অসীমকুমারের মাথায় একটা প্ল্যান খেলল। সে এক নম্বর ঘরে যে ছিল তাকে দু নম্বরে পাঠিয়ে দিল, দু নম্বরকে তিন নম্বর ঘরে, তিন নম্বরকে চার নম্বর ঘরে ইত্যাদি। এবার ভি·আই·পিকে দিয়ে দিল এক নম্বর ঘরটা। সমস্যার সমাধান করে সবে অসীমকুমার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসবে, এমন সময় তার তিন বন্ধু এসে হাজির। ঠিক হ্যায়। অসীমকুমার ভি· আই· পিকে চালান করল চার নম্বর ঘরে, দু নম্বরে যে ছিল তাকে পাঁচ নম্বর ঘরে, তিন নম্বরকে ছ' নম্বর ঘরে ইত্যাদি। তারপর তার তিন বন্ধুকে এক থেকে তিন নম্বর ঘরটা ছেড়ে দিল। কিন্তু ঝামেলার কি শেষ আছে। লবিতে ফিরেই অসীমকুমারের চক্ষু চড়কগাছ ! মহাখ্যাপা দুর্বাসা মুনি তাঁর অসীম-সংখ্যক শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে কলকাতার পুজো দেখতে এসেছেন। এখন অসীমকুমার কী করবে ? ভাগ্যিস ওর খুড়তুতো ভাই রতন সেখানে ছিল। রতনের আবার অঙ্কের মাথা খুব সাফ। সে বলল, হোটেলের প্রত্যেককে তাদের ঘরের দ্বিগুণ নম্বর ঘরে পাঠিয়ে দিতে। অর্থাৎ এক নম্বর যাবে দু'নম্বর ঘরে, দু'নম্বর চার নম্বর ঘরে, তিন নম্বর ছ' নম্বর ঘরে ইত্যাদি। অর্থাৎ সমস্ত অতিথিই চলে যাবে অসীম-সংখ্যক জোড় নম্বর ঘরে। আর তার ফলে অসীম-সংখ্যক বিজোড় নম্বর ঘর ফাঁকা হয়ে যাবে। সেখানে দুর্বাসা মুনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আস্তানা গাড়তে পারবেন।

ভেবে দ্যাখো, হোটেল বানাতে হলে এমন হোটেলই তো বানানো দরকার !

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

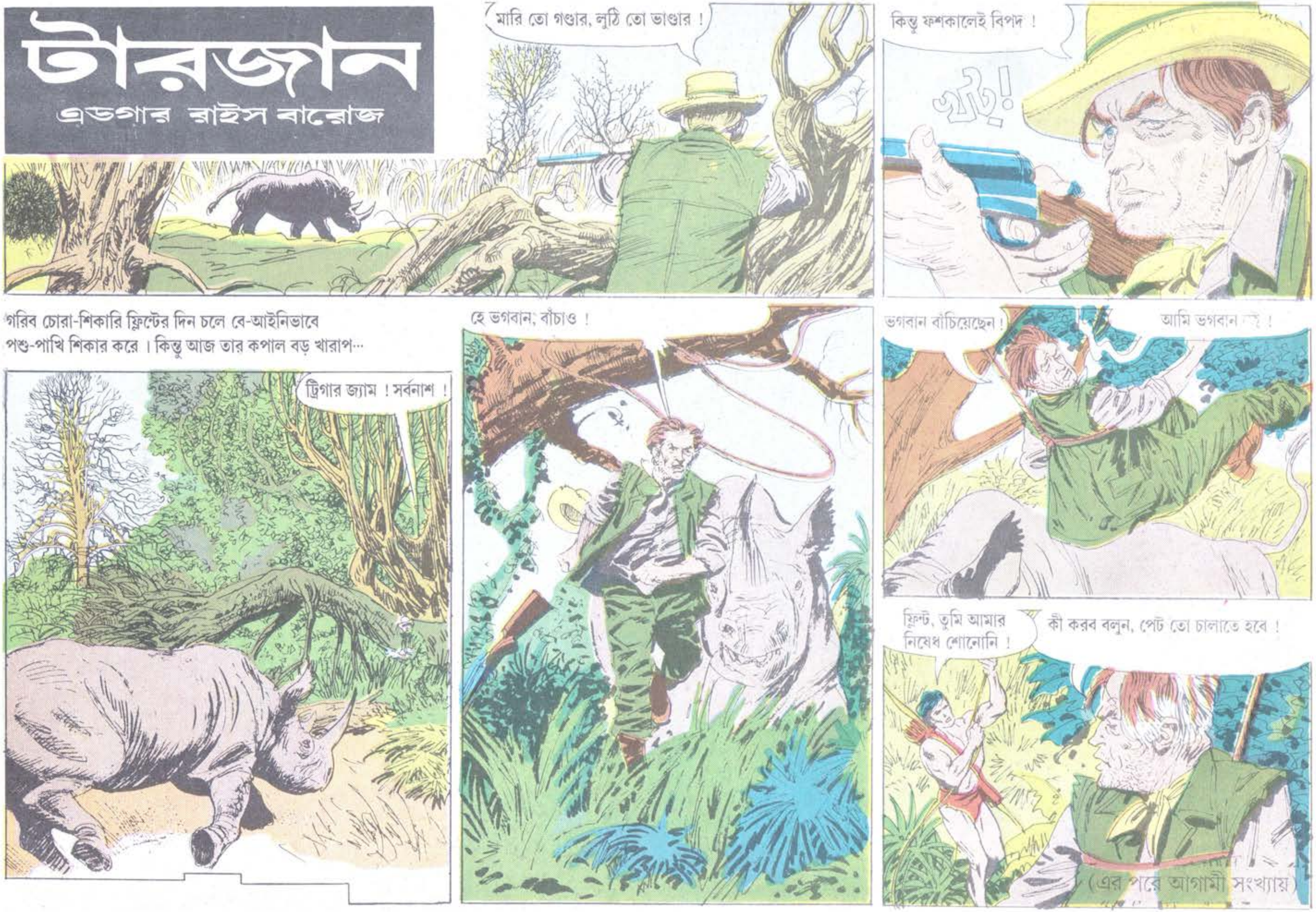
মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার !
কিন্তু ফশকালেই বিপদ !
খ্যাঁচ!
গরিব চোরা-শিকারি ফ্লিন্টের দিন চলে বে-আইনিভাবে পশু-পাখি শিকার করে । কিন্তু আজ তার কপাল বড় খারাপ...
ট্রিগার জ্যাম ! সর্বনাশ !
হে ভগবান; বাঁচাও !
ভগবান বাঁচিয়েছেন !
আমি ভগবান নই !
ফ্লিন্ট, তুমি আমার নিষেধ শোনোনি !
কী করব বলুন, পেট তো চালাতে হবে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে পঞ্চানন্দ জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভটবিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুকে সে একটা পুরনো চাবি দিয়ে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে যে-মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, বাসের মধ্যে খুন হয় তাঁর সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চক-সাহেবের পোড়োবাড়িতে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে। চক-সাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। চক-সাহেবের বাড়িতে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে ঘায়েল করে সেই তিনটে অতিকায় লোক, গজকে যারা আটকে রেখেছে। বিদ্যুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বুঝে এগিয়ে যেতেই কাঁকড়াবিছের কামড় খায় গজ, তারপর খানিক হেঁটে এক জলায় বেহুঁশ পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পঞ্চানন্দও খানিক এগিয়ে গজ'র খোঁজ পায়। কিন্তু গজ'র ছিপছিপে শরীর ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। উড়ন্ত চাকি দেখে ঘড়ি ও আংটিও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চক-সাহেবের বাড়িতে ঢুকে আংটি ঘুম লাগায়। ঘড়ি যে কাঁকড়াবিছেটাকে জুতোর তলায় চেপে ধরে, সেটা যান্ত্রিক। এদিকে আংটি সন্ধান পায় প্রথমে সেই মহারাজার 'মৃত' সেক্রেটারির, পরে স্বয়ং মহারাজার। মহারাজা বলেন, অন্য নক্ষত্র-মণ্ডলের লোকেরা পৃথিবীকে চুরি করতে চায়। হরিবাবু ওদিকে 'ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ'-এর সূত্র ধরে মধ্যরাতে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। তারপর…

একটা হোঁচট খাওয়ার পর হরিবাবুকে থেমে পড়তে হল। পড়েই যাচ্ছিলেন। কোনওরকমে সামলে নিয়ে চারদিকটা খেয়াল করে যা দেখলেন, তাতে বেশ অবাক হওয়ার কথা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি ঈশান কোণ লক্ষ করে হাঁটা ধরেছিলেন। এতক্ষণে মাইলটাক দূরে গিয়ে পৌঁছনোর কথা। কিন্তু মাথায় কবিতার পোকা ওড়াউড়ি করছিল বলে দিক ভুল করে তিনি ফের নিজের বাড়ির মধ্যেই ফিরে এসেছেন যেন !

হ্যাঁ, এটা তাঁদেরই বাড়ি বটে। ওই তো সামনে ঝুপসি কেয়াঝোপ। তার ওপাশে তাঁর বাবার ল্যাবরেটরি। তারপর বাগান, তার ওপাশে তাঁদের বাড়িটা। ফটফটে জ্যোৎস্নায় সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হরিবাবু একটু অপ্রতিভ বোধ করলেন। লজ্জা পেয়ে একা একাই জিভ কাটলেন তিনি।

ভোর হতে এখনও ঢের দেরি। হরিবাবু বাগানের মধ্যেই কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন। গুনগুন করে গান গাইলেন একটু। কবিতার লাইনও ভাববার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাথায় তেমন কোনও লাইন এল না।

তিনি কবিতার মানুষ। সেইজন্যই বোধহয় নিজের বাবার ল্যাবরেটরিতে তিনি বিশেষ ঢোকেননি। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। তবে পঞ্চানন্দ শিবু হালদারের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যে-সব গল্প তাঁকে শুনিয়েছে, তা যদি সত্য হয় তবে বিজ্ঞান জিনিসটা বিশেষ খারাপ নয় বোধহয়। বিজ্ঞান বিষয়ে দু' একটা কবিতাও লিখে ফেলা বোধহয় সম্ভব।

ভাবতে ভাবতে তিনি ল্যাবরেটরিটার দিকে এগোলেন। দেখলেন, দরজাটা ভেজানো থাকলেও তালা লাগানো নেই। বস্তুত ভাঙা তালাটা মেঝের ওপর পড়ে ছিল। কিন্তু হরিবাবু সেটা লক্ষ না করে ঘরে ঢুকলেন। তারপর বাতি জ্বালালেন। চারদিকটা বেশ অগোছালা হয়ে আছে। দেরাজ খোলা, আলমারি হাঁটকানো, যন্ত্রপাতিও অনেকগুলো চিত বা কাত হয়ে পড়ে আছে।

হরিবাবু তাঁর বাবার গবেষণাগারটি হাঁ হয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর এটা-ওটা একটু-একটু করে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। অবশ্য কিছুই তেমন বুঝতে পারলেন না।

এই ল্যাবরেটরিতে তিনি ছেলেবেলায় মাঝে-মাঝে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ঢুকে পড়তেন। কাজের সময় ছেলেপুলেদের উৎপাতে বিরক্ত হলেও শিবুবাবু তেমন কিছু বলতেন না ছেলেকে। বহুকাল বাদে বাবার কথা মনে পড়ায় হরিবাবুর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল।

হরিবাবুর মনে পড়ল, একবার দেয়াল-আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন লুকোতে গিয়ে। নীচের তাকটা বেশ বড়ই ছিল। তার মধ্যে থাকত পুরনো সব কাগজপত্র। তার মধ্যে লুকোতে খুব সুবিধে। তা সেই রকম লুকিয়ে আলমারির দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাঁ ধারে একটা বোতামের মতো দেখতে পেয়ে সেটা খুঁটতে শুরু করেছিলেন। তখন হঠাৎ পিছনের দেয়ালটা হড়াস করে খুলে গেল। আর হরিবাবু উলটে একটা চৌকোমতো গর্তে পড়ে গেলেন। তেমন যে চোট পেয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু লুকোনো গর্ত আবিষ্কার করে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শিবুবাবুই তাঁকে টেনে তুলেছিলেন গর্ত থেকে।

অনেক দিন কেটে গেছে। সেই লুকোচুরি খেলা, সেই গর্তে পড়ে যাওয়ার কথা ভেবে আজ হরিবাবুর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জনের পর হরিবাবু চোখ মুছলেন। দেয়াল-আলমারিটা এখনও তেমনি আছে। হরিবাবু সেটা খুলে ডাঁই করা পুরনো কাগজপত্র সরিয়ে সেই বোতামটা বের করলেন। আজ আবার তাঁর সেইরকম লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

ইচ্ছেটা এমনই প্রবল হয়ে উঠল যে, হরিবাবু নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না। হামাগুড়ি দিয়ে পুরনো কাগজপত্র ঠেলে অন্যধারে সরিয়ে ঢুকে পড়লেন ভিতরে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে তাঁর নিজেকে ফের শিশু বলে মনে হতে লাগল। বয়স যেন অনেক বছর কমে গেছে।

বেখেয়ালে তিনি দেয়ালের গায়ে বোতামটাকে খুঁটতে লাগলেন।

ঘটনাটা এমন আচমকা ঘটল যে, হরিবাবু সাবধান হওয়ার কোনও রকম সুযোগই পেলেন না। সেই বহুকাল আগের মতোই পিছনে একটা ফোকর হঠাৎ দেখা দিল এবং হরিবাবু হড়াস করে একটা চৌকো গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন।

তবে বয়সটা আর তো সত্যিই অত কম নয়। সেবার পড়ে গিয়ে তেমন ব্যথা পাননি। এবারে পেলেন। মাথাটায় ঝং করে কী যেন লাগল। ঝিমঝিম করে উঠল মাথা। চোখে কিছুক্ষণ অন্ধকার দেখলেন হরিবাবু।

গর্তটা মাঝারি মাপের। অনেকটা জলের চৌবাচ্চার মতো। অন্ধকারে খুব ভাল করে কিছু বোঝা যায় না।

পতনজনিত ভ্যাবাচ্যাকা ভাব আর ব্যথার প্রথম তীব্রতাটা কাটিয়ে উঠে হরিবাবু হাতড়ে-হাতড়ে চারদিকটা দেখলেন। একটা গোল ছোট বলের মতো জিনিস তাঁর হাতে ঠেকল। তিনি বস্তুটা কুড়িয়ে নিলেন। খুবই ভারী জিনিসটা। আর বলের মতো মসৃণ নয়। বস্তুটার গায়ে নানারকম খাঁজ আর ছোট-ছোট টিপ-বোতামের মতো কী সব যেন লাগানো আছে।

হরিবাবু জিনিসটা পকেটে পুরে ধীরেসুস্থে উঠে পড়লেন। হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসে গর্তটার কপাট আঁটলেন। তারপর আলমারি বন্ধ করে ল্যাবরেটরির আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

ব্রাহ্মমুহূর্তটা পড়াশুনোর পক্ষে খুবই ভাল সময়। হরিবাবু ভাবলেন, এখন ঘড়ি আর আংটিকে ঘুম থেকে তুলে দেবেন। তারপর পঞ্চানন্দকে ডেকে নিয়ে ফের একবার বেড়াতে বেরোবেন। অবশ্য হাতে ঘড়ি না থাকায় হরিবাবু বুঝতে পারছিলেন না, এখন ঠিক ক'টা বাজে। যটাই বাজুক, ব্রাহ্মমুহূর্তটা আজ তিনি পেরোতে দেবেন না কিছুতেই।

দোতলায় উঠে তিনি ছেলেদের ঘরে গিয়ে হানা দিলেন।

"এই ওঠ, ওঠ, পড়তে বসে পড়। আর দেরি করা ঠিক নয়।"

ডাকতে গিয়ে হরিবাবু দেখে খুশিই হলেন যে, ছেলেরা কেউ বিছানায় নেই। তার মানে দুজনেই উঠে পড়েছে। এই তো চাই।

একতলায় নেমে এসে হরিবাবু পঞ্চানন্দের খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন, সেও বিছানায় নেই।

বাঃ। সকলেই ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে পড়ছে আজকাল! এ তো খুবই ভাল লক্ষণ!

হরিবাবু আর দেরি করলেন না। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তাঘাট তিনি ভালই চেনেন। কিন্তু অন্যমনস্কতার দরুন এক রাস্তায় যেতে আর-এক রাস্তায় চলে যান। এ ছাড়া তাঁর আর কোনও অসুবিধে নেই।

আজও হাঁটতে-হাঁটতে ব্রাহ্মমুহূর্ত নিয়ে একটা কবিতা লেখার কথা ভাবতে লাগলেন। ভাবতে-ভাবতে রাস্তাঘাট ভুল হয়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণ অচেনা একটা জায়গায় চলে এলেন।

মহারাজ টিভির মতো যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়ে আংটির দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ, না?"

আংটি সত্যিই ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। রূপকথার গল্পেও এরকম ঘটনার কথা নেই। গোটা পৃথিবীটাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায় কিছু লোক, এ কি সম্ভব?

শিহরিত হয়ে আংটি বলল, "আপনি আসলে কে, আমাকে বলবেন?"

মহারাজ হাসলেন। বললেন, "আর যাই হই আমি গুলবাজ নই। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।"

আংটি কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "আপনি আমাদের বাঁচানোর জন্য কিছু করতে পারেন না?"

মহারাজ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু বিপদ কী জানো? এদের ধ্বংস করার মতো যে অস্ত্র আমার কাছে আছে, তা প্রয়োগ করলে পৃথিবীও ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আংটি হঠাৎ এই প্রসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রশ্ন করল, "আপনি অন্য গ্রহের মানুষ হয়েও এমন চমৎকার বাংলা শিখলেন কী করে?"

মহারাজ একটু হেসে বললেন, "শুধু বাংলা নয়, পৃথিবীর অনেক ভাষাই আমাকে শিখতে হয়েছে। তোমরা ভাষা শেখো, আমরা শিখি ধ্বনি। আমাদের মাথাও অবশ্য একটু বেশি উর্বর। শিখতে সময় লাগে না। তা ছাড়া আছে অনুবাদযন্ত্র। যে-কোনও ভাষাই তুমি বলো না কেন, তা আমার ভাষায় অনুবাদ হয়ে আমার কানে পৌঁছবে, আমার ভাষা তোমার ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাবে।"

আংটির মাথায় একটা স্মৃতি খেলা করে গেল। সে রামরাহা নামে একজন লোকের কথা কোনও বইতে পড়েছিল। এই সেই রামরাহা নয় তো!

আংটিকে কিছু বলতে হল না। মহারাজ নিজেই একটু মুচকি হেসে বললেন, "ঠিকই ধরেছ। আমিই সেই রামরাহা।"

"আপনি একশো মাইল স্পিডে দৌড়োতে পারেন! দশ ফুট হাইজাম্প দিতে পারেন!"

মহারাজ হাত তুলে বললেন, "ব্যস্, থামো। তোমার কাছে যেটা বিস্ময়কর ক্ষমতা বলে মনে হচ্ছে, আমাদের কাছে তা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।"

"আপনি তো ইচ্ছে করলেই ওই বর্বরদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন।"

রামরাহা দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না আংটি, এই বর্বররা আমার চেয়ে কম ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু সে-কথা যাক। আমার কাছে একটা অত্যন্ত সেনসিটিভ ট্রেসার আছে। তা দিয়ে পৃথিবীর কোথায় কোন্ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে বা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেগুলো ধরা যায়। কয়েকদিন আগে ট্রেসারে আমি একটা কাঁপন লক্ষ করি। মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে এমন একটা যন্ত্র বা শক্তির উৎস আছে যা অকল্পনীয়। আমি সেই উৎসের সন্ধানে খুঁজে-খুঁজে যন্ত্রের নির্দেশে এখানে এসে হাজির হই। এখানেই আস্তানা গেড়ে কয়েকদিন হল বসে আছি। বুঝতে পারছি উৎসটা এখানেই কোথাও আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারছি না। আশ্চর্যের বিষয় যখন ক্রিকেট খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম,তখন ট্রেসারে সেই কম্পন ধরা পড়ে। তোমাদের গা থেকে সেই শক্তির একটা আভাস আসছিল। সেজন্যই তোমাদের দু' ভাইকে তুলে এনেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম, তোমাদের কাছে জিনিসটা নেই।"

"কীভাবে বুঝলেন?"

"তোমাদের মগজ এক্স-রে করে।" (ক্রমশ)

BOROLINE
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM

সংসারের হাজার কাজ, বাজার-হাট, ঘরে বাইরে
নানান ব্যস্ততা। এদিক ওদিক খুঁটিনাটি কত কী।
এত ঝামেলার মধ্যেও সুস্থ সতেজ ত্বক — এ শুধু
বোরোলীনই পারে।

ঘরে বাইরের সাথী

বোরোলীনের কোমল যত্ন শুষ্কতা, গা-হাত-পা
ফাটা ও র‍্যাশ বেরোনোর থেকে ত্বককে রক্ষা করে।
বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক ক্ষমতা
রোজকার সাধারণ কাটাছড়ায় দারুণ কাজ দেয়।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

ত্বকের নিয়মিত সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
কলকাতা ৭০০০৮৮

সম্পূর্ণ উপন্যাস

রুক'স নেস্ট

অভিজিৎ চৌধুরী

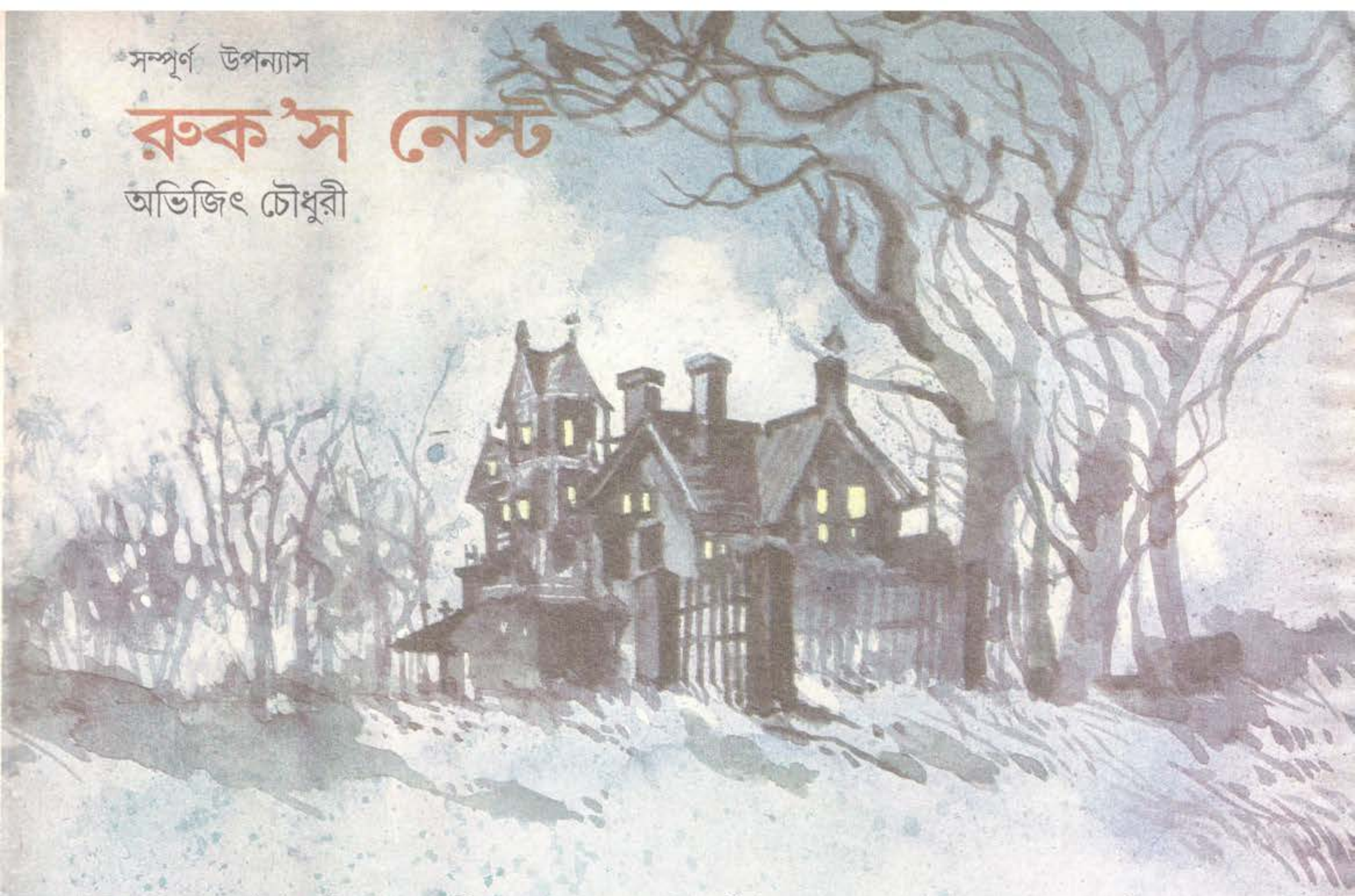

দাদামশাইয়ের ডায়েরি থেকে

“গাছপালার ভেতর দিয়ে, পড়ন্ত বিকেলের আলোয়, রুক্‌'স নেস্ট-এর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, কেন জানি না, একটা মন কেমন করানো, কীরকম যেন একটা অনুভূতি হল।

“বাড়িটা সব সময় এত অন্ধকার। কেউ বোধহয় থাকে না। কাউকে দেখিনি এ পর্যন্ত।

“লোহার গেটটা সব সময় বন্ধ থাকে। একদিকের একটা পিলারে সাদা পাথরের ওপর কালো দিয়ে লেখা, 'রুক'স নেস্ট'। বাড়িটার নাম কে রুক'স নেস্ট রেখেছিল কে জানে।

“বিকেলে হাঁটতে বেরোনোর সময় চারিদিকের উঁচু-নিচু মাঠের ওপর লেবু-হলুদ রঙের রোদ ছড়িয়েছিল। এখন ফেরার সময় অন্ধকার আর মুণ্ডাদের গ্রামের কাঠকুটো, শুকনোপাতা-জ্বালানো ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলেমিশে ঝাপসা চারদিক।

“পাখিদের একটা সম্মিলিত কোলাহল ক্রমশ মিলিয়ে আসছে।

“নভেম্বরের ফুরিয়ে-আসা-বিকেলের আকাশে যে বিষণ্ণ লাল আলোটা লেগে থাকে, সেটা তখনও লেগে আছে। হিম পড়ছে। শীতে আমার নাক, কান, হাতের পাতা বরফ হয়ে গেছে। রাঁচির চড়াই-উতরাই ভেঙে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসার জন্যে বড় বড় নিশ্বাস নিতে হচ্ছে। এত ঠাণ্ডা হাওয়া যে, নাক জ্বালা করছে।

“বিকেল আর সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণের সেই অলৌকিক অপস্রিয়মাণ আলোয়, সেই আকাশের ওপর সিলুয়েটেড্ গাছপালার ভেতর, অন্ধকার রুক'স নেস্ট যেন একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

“আর আজ এই প্রথম আমি লক্ষ করলাম, রুক'স নেস্ট-এর কম্পাউণ্ডের বিশাল বিশাল গাছগুলোর ডালপালার' ভেতর যেন কবরের নৈঃশব্দ্য। কোথাও কোনও পাখির সাড়াশব্দ নেই। পাখা ঝট্‌পটিয়ে ওঠার শব্দ। অকস্মাৎ ভয় পেয়ে ডেকে ওঠার শব্দ। কিংবা প্যাঁচার। কিংবা বাদুড়ের উড়ে যাওয়ার। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু ঝিঁঝিদের একটা একটানা ঝিমঝিম ছাড়া ভয় করে, এমন নিঃশব্দ এই জায়গাটা।” ...

ছোটদাদামশাইয়ের মধুপুরের বাড়ির একতলার তালাবন্ধ, অন্ধকার ঘরগুলোতে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, কীরকম একটা সোঁদা বাতাসের গন্ধ। বন্ধ জানলার রঙিন কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে আসা আলোয় রহস্যময়। আমার দারুণ ভাল লাগে।

কীরকম শিকলি দিয়ে ঝোলানো আগেকার দিনের বিলিতি আলোর শেড্। ধুলো আর ঝুল জমে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পুরনো, বিলেতে তৈরি, অদ্ভুত দেখতে, মোটরওলা ননক্যাপাসিটার সিলিং ফ্যান।

কতদিনের অব্যবহৃত ধুলো-জমা ফার্নিচার। সব কিছুর কালো পালিশ। সেকেলে ডিজাইন। কী দারুণ আগেকার দিনের মতো দেখতে।

দেওয়ালের ঘড়িটা কী বড়। তার ভেতর 'মেড ইন জাপান' লেখা। চলে না। কেউ দমই দেয় না। কেউ তো

আসে না এই ঘরগুলোয়।

ঘড়িটা থেমে আছে।

এই ঘরগুলোর তিনটেতে ছোটদাদামশাইয়ের ল্যাব্। দেওয়ালের র‍্যাকে সারি-সারি ছোটদাদামশাইয়ের হাতে-লেখা লেবেল-লাগানো গ্লাস-কন্টেনারে কপার সালফেট্, জিঙ্ক অক্সাইড্, টিঙ্কচার বেনজয়েন, রেক্টিফায়েড স্পিরিট, স্যালিসিটিক্ অ্যাসিড্, আরও কত কী।

ঘরের তিনদিকে কাঠের টেবিল। তিনটে সিঙ্ক, চারটে বান্সেন বার্নার, তেপায়া স্ট্যাণ্ড, ফিল্টার পাম্প্, কিপ্স অ্যাপারেটাস্। একটা নিক্তি। ঘরের মাঝখানে একটা অ্যাজবেস্টস প্লেটেড টেবিল। তার ওপর কতগুলো টেস্টটিউব-স্ট্যাণ্ডে অজস্র টেস্টটিউব দাঁড় করানো। গ্লাসরিটর্ট। ক্ল্যাম্প্-স্ট্যাণ্ডে কতগুলো কাঁচের ফ্লাস্ক।

সর্বত্র ধুলো জমে আছে। ইঁদুর ঘোরাঘুরি করে। আর ঘুলঘুলি দিয়ে চড়াইপাখি ঢুকে এসে ফরর-ফরর করে অদ্ভুত কতগুলো কার্ভে ওড়াউড়ি করে, দুটো-তিনটে ঝুপ করে নেমে আসে। খড়কুটো ছড়িয়ে, আবার কোথায় কোন্ ফুটো দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের ডানার সেই ঝট্পট্ আওয়াজ থেমে গেলে পড়ে থাকে শুধু নৈঃশব্দ্য।

এখন তো আর এই ঘরগুলো ব্যবহার করা হয় না। আমি মাঝে-মাঝে চাবি খুলে চলে আসি। দরজা বন্ধ করে দিলেই বাইরের পৃথিবী থেকে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যেন একটা অন্য জগতে।

তবে বাইরে এখন কী হচ্ছে আমি বলে দিতে পারি।

দোতলার গোল বারান্দায় বসে ছোটদাদামশাই চিঠি লিখছেন। কিংবা বই অথবা খবরের কাগজ পড়ছেন।

বাগানের নিমগাছের কতগুলো ডালপালা বারান্দা অবধি এগিয়ে এসেছে, আর তার পাতায় পাতায় একটা মন কেমন করানো শন্শন্ ঝরঝর মর্মর-ধ্বনি হচ্ছে। আর একটা কাক রেলিংয়ে বসে একটা বিষণ্ণ গলায় থেমে-থেমে চেপে-চেপে, মাঝে-মাঝে ডাকছে। আর বাগানে একটা ছাইরঙের ঘুঘুপাখি, যাকে বলে কমন্ ডাভ্, ঘাসের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সমানে সেই অদ্ভুত ডাকটা ডেকে চলেছে, যেটা শুনলেই কবেকার সব ভুলে যাওয়া, আদ্ধেক মনে পড়া, আদ্ধেক না পড়া, দুঃখরা ফিসফিস করে ওঠে বুকের মধ্যে। শীতের দুপুরের ফিসফিসে হাওয়ার মতো।

আর কোথায় যেন লাঠাখাম্বায় জল তুলছে কে। তার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ, টানা টানা আওয়াজটা ভেসে আসছে শীতের শিরশিরে হাওয়ায়।

মধুপুরে এমনি সব আশ্চর্য সুন্দর দুপুর, সকাল, ভোর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত আছে বলেই ছোটদাদামশাই এখান থেকে আর কোথাও যেতে পারলেন না। আর তাই আমারও এখানে বেড়াতে আসতে এত ভাল লাগে।

আমি লাইব্রেরি-ঘরের আলমারিগুলো খুলে খুলে বই ঘাঁটতে লাগলাম।

কত পুরনো প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দেশ, রিডার্স ডাইজেস্ট, ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক্।

একটা আলমারির কাঁচের ওপর 'ইথলজি' কথাটা লেখা দেখে কৌতূহল হল। ইথলজি মানে যে আচরণ-বিজ্ঞানের একটা বিশেষ ডিসিপ্লিন, যেটা মনুষ্যেতর প্রাণীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে, সেটা আমি জানতাম। যেটা জানতাম না, তা হল ছোটদাদামশাই কোনও একটা সময় ইথলজি সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। অথবা হয়েছিলেন।

ছোটদাদামশাইয়ের কতগুলো খাতা। ওয়াইল্ড-লাইফের ওপর দারুণ দারুণ ছবিওলা অনেকগুলো বই। কার্নিভোরাস বার্ডস, ইণ্ডিয়ান বার্ডস অব প্রে, ওয়াইল্ড লাইফ বাই নাইট, কিং সলোমন'স রিং, অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার, দা ভায়লেন্ট স্ট্রিক।

বইগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে আলমারির একটা তাকের পেছন দিকে এক কোনায় একটা ফাইল আবিষ্কার করলাম।

সবুজরঙের শক্ত মলাটের ফাইলটার ওপর নাম লেখা : কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী। তার নীচে লেখা—রেফারেন্স : ট্রায়াল কেসেজ্ আণ্ডার অবজার্ভেশন।

ফাইলটার কাগজগুলো খুব পুরনো। পোকায় ফুটো করে দিয়েছে। কাগজের ভেতরের ফেরিক কম্পাউণ্ড অক্সিডাইজ করার জন্যে কাগজগুলো হলুদ হয়ে গেছে। এত ভঙ্গুর হয়ে গেছে যে, খুললেই ঝরে-ঝরে পড়ছে।

সেই সঙ্গে একটা ডায়েরি পেলাম। ডায়েরিটা ছোটদাদামশাইয়ের।

ডায়েরির পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে এক জায়গায় এসে আমার চোখ আটকে গেল।

রাঁচির কোনও একটা ছোট্ট জায়গায় সে-সময়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন ছোটদাদামশাই। বিকেলের কাছাকাছি ছোটদাদামশাই হাঁটতে বেরোন। বেড়িয়ে ফেরার সময় মাঝে-মাঝে একটা বাড়ির সামনে দিয়ে আসেন ছোটদাদামশাই।

বাড়িটার কথা প্রায়ই লিখেছেন ডায়েরিতে। বাড়িটার নাম রুক'স নেস্ট।

দাদামশাইয়ের ডায়েরি থেকে-২

"রুক'স নেস্ট বাড়িটা যাঁর, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী।

"বিকেলের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছিলাম। শহরের বাড়িঘর মিলিয়ে গিয়ে দুধারে হু-হু করা মাঠ দূরে দৃষ্টির সীমায় যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে সেই প্রান্তরেখায় নীলমেঘের মতো পাহাড়।

"কাছেই একটা পাহাড়ি নদী। তার বালির রঙ সাদা। পায়ের পাতার মতো। আর তার জল ঠিক কাঁচের মতো স্বচ্ছ। গোড়ালি অবধি ভেজে। সবাই হেঁটেই পার হয়ে যায়। এখানকার পাথুরে মাটি বৃষ্টির জল শুষে নিতে পারে না বলে কোথায় কোন্ পাথরের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির করে চুঁইয়ে এসে একটা স্বপ্নের নদী হয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় পৌঁছে আবার স্বপ্নেরই মতো কোথাও হারিয়ে যায়, বালির ভেতর। গোরুর-গাড়ির চাকার দাগ গভীর হয়ে থাকে। ভিজে বালির ওপর। শুকিয়ে যায়। তবু একটা গভীর দাগ থেকেই যায়। এক একটা স্মৃতির মতন।

"ছোটনাগপুর জায়গাটা আসলে ওল্ড্ ক্রাস্টাল রক্স-এর একটা স্টেব্ল ব্লক। ওপরের ক্রাস্টে প্রচুর ফল্টিং আর ফ্র্যাক্চারিং-এর জন্যে ক্ষয়ে ক্ষয়ে দারুণ সব খোয়াই তৈরি

হয়েছে । মাটিতে লোহা আছে, তাই মাটির রং লাল ।

"চারদিকে শোরিয়া রোবাস্টা মানে শালের জঙ্গল । পথের ধারে-ধারে ল্যান্‌টেনা ক্যামারা ।

"শীতের বিকেল দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায় । হিম পড়তে শুরু করেছে এরই মধ্যে । মাথায় উলের টুপি, গলায় মাফ্‌লার, গায়ে ওভারকোট থাকা সত্ত্বেও নাকের ভেতর সুড়সুড় করছে ।

"আকাশে তখনও একটা ম্লান বিষণ্ণ আলো লেগে আছে । সেই অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের ওপর একটা সিলুয়েট্ ছবির মতো দেখাচ্ছে চার্চের চুড়োটাকে ।

"গাছপালার কয়েকটা পাতা-ঝরে-যাওয়া ডাল সামনে এসে পড়েছে । তাদের ভেতর দিয়ে সাদা গির্জাটার পিছনে ঝিনুকের মতো একটা হলুদ চাঁদ উঠেছে ।

"চার্চ ইয়ার্ডের সারি-সারি কবরের ওপর ম্লান জ্যোৎস্না এসে পড়েছে । হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, সেই কুয়াশা-নামা কবরখানায় ছায়ার মতো একজন লোক ঝুঁকে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ঝোপের ভেতর কী যেন লক্ষ করছেন । ঝোপটার ভেতর পর্যবেক্ষণ শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেলেন গেটের বাইরে ।

"কিছুক্ষণ দূর থেকে আমাকে লক্ষ করার পর আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বার্ড ওয়াচার ?'

"ভদ্রলোক আমার দূরবিনটা লক্ষ করেছেন ।

"আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ ।' তারপর জানালাম, আমি কলকাতায় থাকি । এখানে বেড়াতে এসেছি । বার্ডওয়াচিংটা আমার শখ । তারপর নিজের পরিচয় দিলাম ।

"ভদ্রলোকের নাম কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী । কোথায় থাকেন জানতে চাওয়ায় বললেন, 'রুক'স নেস্ট ।'

"আমি সন্ধ্যাবেলা ফেরার সময় রুক'স নেস্ট-এর নির্জন চেহারাটা দেখতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আজ হঠাৎ সেই বাড়িটায় একজন মানুষের বাস করার খবরে চমকে উঠলাম ।

"ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, অরনিথলজিস্ট্ । পক্ষিতত্ত্ববিদ্ । বয়স বোঝা যায় না । রোগা কাঠির মতো চেহারা । ঘাড়ের কাছে মাথার চুলগুলো খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে । একটা শার্ট পরে আছেন, সেটার রঙটাই ধূসর, না সাদা শার্ট ময়লা হয়ে ছাই-ছাই দেখাচ্ছে, ঠিক বোঝা গেল না । বহু পুরনো, সুতো-ওঠা, অনেকবার তালি-দেওয়া ছাতার কাপড়ের রঙের একটা স্যুট পরে আছেন ।

"ভদ্রলোকের চেহারার কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে । পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও একটা ভীষণ অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে লাগল ভদ্রলোককে দেখে ।

"এই ঠাণ্ডায় সন্ধ্যাবেলায় এখানে কী করছেন জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'একটা ফার্স্ট ক্লাস গন্ধ পাচ্ছেন না ?"

"আমি দু'চারবার বড়-বড় নিশ্বাস নিয়ে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছু না পেয়ে অবাক হয়ে বললাম, 'কিসের গন্ধ ?'

"ভদ্রলোক ঝোপের ভেতর কী যেন খুঁজতে-খুঁজতে, গন্ধটা কোন দিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করতে করতে, অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'গন্ধে তো মেঠো ইঁদুর বলেই মনে হচ্ছে । তবে কোলা ব্যাং হওয়াও অসম্ভব নয় ।'

"তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটা গা-শিরশির-করানো উৎসাহী গলায় বললেন, 'অল্পক্ষণ আগেই মরেছে । গন্ধটা

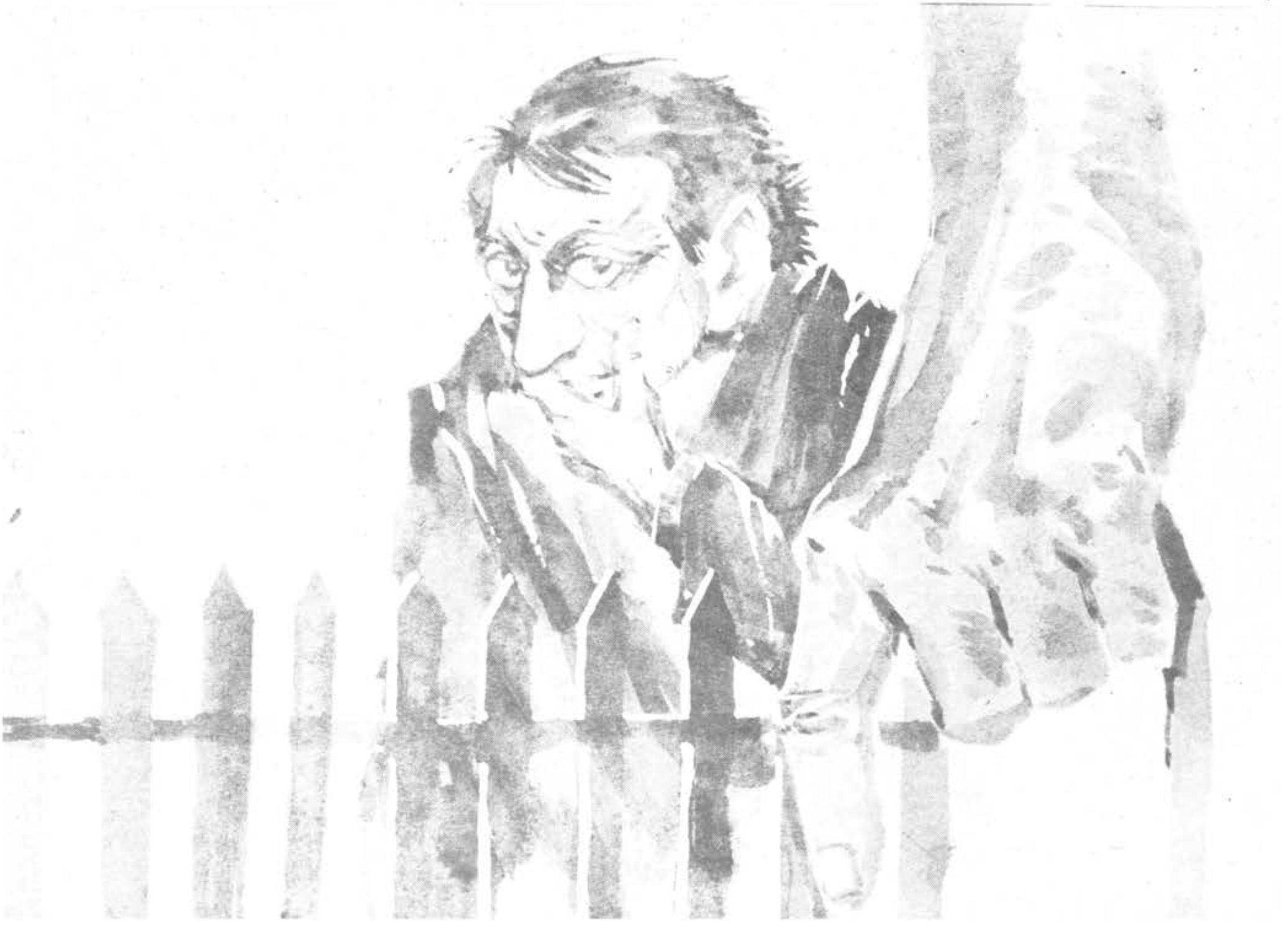

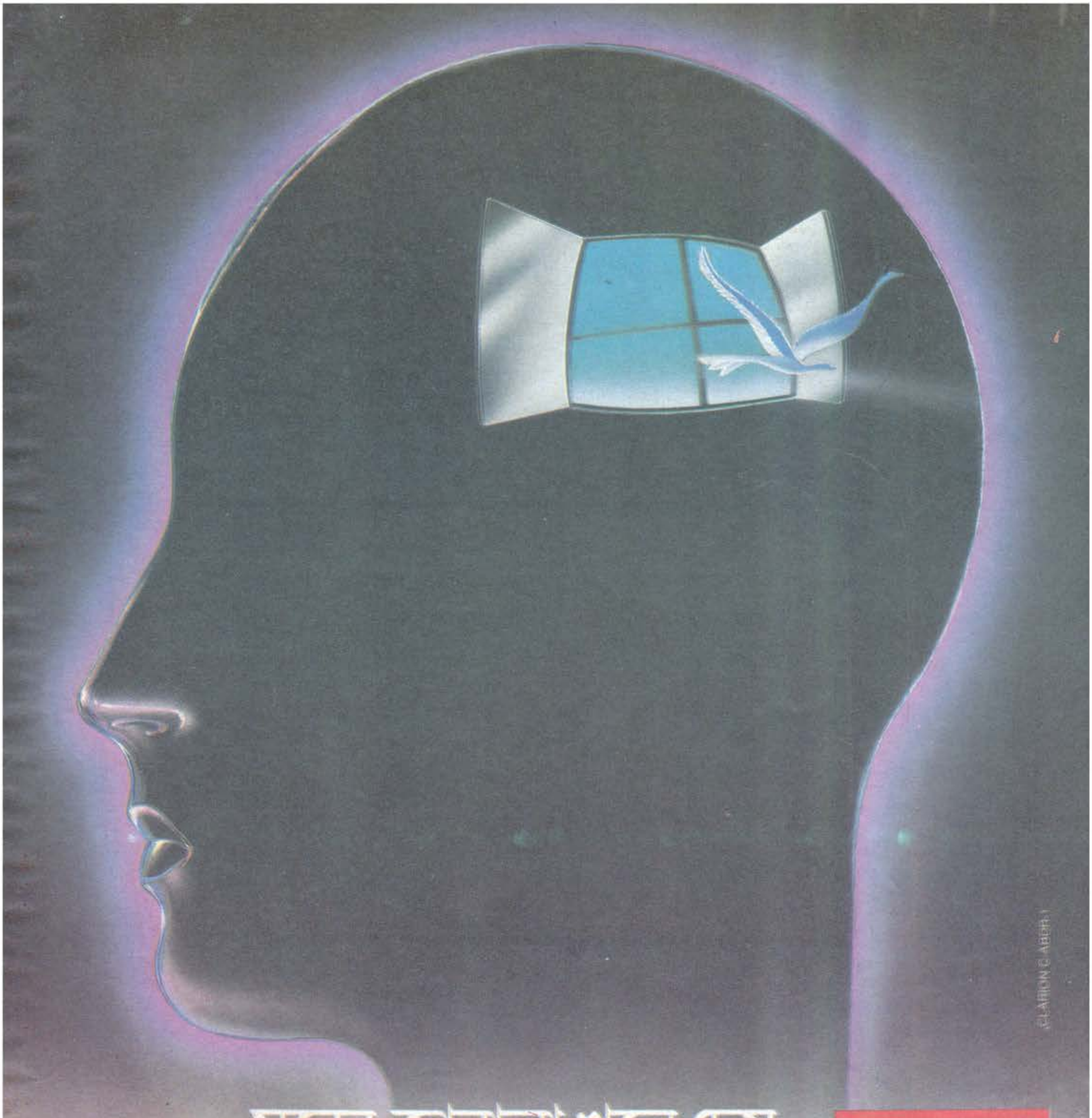

মনের জানালা খুলে দেয়...

পত্রিকা নানান জাতের হয় । এদের মধ্যে বেশ কিছু শুধু পাতা উল্টে পাল্টে দেখার জন্য, কিছুবা নিছক সময় কাটানোর জন্য, আর বিশেষ দু একটা পত্রিকা থাকে যা মনের দিক থেকে সঞ্চয় করে রাখার মত । বলা বাহুল্য, 'দেশ' এই শেষ পর্যায়ে পড়ে ।

'দেশ' বস্তুতঃ, আজ ঠিক যে কোন একটা পত্রিকা নয় । দেশ বিদেশের, এমন কি সারা বিশ্বের যা কিছু জানার, দেখার বা শোনার রয়েছে শুধু 'দেশ' পড়লেই তা আহরণ করা যায় । জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, ভ্রমণ, সাহিত্য, কলাশিল্প, খেলাধূলা, সাক্ষাৎকার—যে কোন দিক থেকেই দেখা যাক না কেন 'দেশ' এক পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা ।

আর আজ বিশেষ করে 'দেশ'-এর প্রতিটি সংখ্যায় রয়েছে এক নতুন প্রতিশ্রুতি । এর প্রচ্ছদপটে সমসাময়িক কালের যা কিছু গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনার সার্থক প্রতিফলন । এর অঙ্গ সজ্জায় এবং মুদ্রণে রয়েছে ঔজ্জ্বল্য ও সমকালীনতার চিহ্ন ।

বাস্তবিকই মনের জানালা খুলে দেওয়ার মত পত্রিকা একটিই । 'দেশ' ।

দেশ

চিন্তার জগতে বাঙলার ও বাঙালীর গৌরব

কীরকম টাট্‌কা দেখছেন না !’

“গন্ধটার উৎস সন্ধান করতে করতে এগিয়ে গেলেন কালীকিঙ্কর। ক্রমশ অন্ধকার গাছপালার জঙ্গলের ভেতর মিশে গেলেন।

“ভদ্রলোকের শেষ কথাটায় চমক ভাঙতে আমার হঠাৎ মনে হল, কালীকিঙ্করের গলাটা যেন একটু বেশি চেরা। অস্বাভাবিক রকম চেরা। চেরার থেকে ‘হোর্স’ বললেই ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো হয়।”

দাদামশাইয়ের ডায়েরি থেকে—৩

“কালীকিঙ্করকে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। স্টেশানের দিকটায় দোকানটোকান, বাজার। রোজ সকালে হাঁটতে-হাঁটতে স্টেশানের দিকে যাই। খবরের কাগজ কিনি। মাটির ভাঁড়ে এলাচ-টেলাচ দেওয়া ফুটন্ত গরম ধোঁয়া-ওঠা চা খাই। যে স্টেশানারি দোকানটা আছে সেখান থেকে দরকারি জিনিসটিনিস কিনি। এখানকার আলাপ-হওয়া-লোকেদের সঙ্গে গল্প-টল্প করি। তারপর আস্তে-আস্তে ফিরে আসি!

“ফেরার পথে এক একদিন মুণ্ডাদের কাছ থেকে খেত থেকে তুলে আনা বরফের মতো ঠাণ্ডা ফুলকপি, বাঁধাকপি, টোমাটো, কড়াইশুঁটি এইসব কিনে আনি। কিংবা ঠাণ্ডা, ভিজে, বালি-মাখা জ্যান্ত মাছ। বাজার, রান্না বাংলোর চৌকিদার করে দেয়।

“বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার নিয়ে বসে থাকতে থাকতে একটু একটু করে শীতের দুপুরের ফুরিয়ে আসা দেখতে দেখতে, অনেকদূর দিয়ে চলে যাওয়া রেলগাড়ির একটা অন্যমনস্ক করে দেওয়া গুম্‌গুম্‌ শব্দ আর মাঝে-মাঝে সেই মন কেমন করানো লম্বা কাঁপা-কাঁপা হুইস্‌ল্‌ শুনতে শুনতে সময় কেটে যায়। কিংবা বই পড়ে অথবা চিঠি লিখে।

“তারপর শীতের দুপুর যখন পড়ে আসে, রোদ ম্লান হয়ে আসে, ছায়ারা ঝুঁকে পড়ে মাটিতে, তখন গাছেরা হঠাৎ শান্ত চুপচাপ হয়ে যায়। হাওয়ারা ঘুমিয়ে পড়ে। গাছেরা তখন কী স্থির, কী শান্ত। যেন শনি রবিবার হুটোপুটি করার পর রবিবার সন্ধেবেলা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, কালকের হোমওয়ার্ক করা হয়নি।

“মাঠে মাঠে কুয়াশা নামে। সারাদিনের জেগে থাকার শেষে, ঘুমের মতন, চোখের পাতার মতন অন্ধকার নামে।

“একদিন বিকেলে বাংলোর বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় বাগানের গেট ঠেলে কালীকিঙ্করকে ঢুকতে দেখলাম।

“বাগান পেরিয়ে মোরামের রাস্তায় হেঁটে এসে বারান্দার কয়েক ধাপ সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সেই অভিব্যক্তিহীনভাবে তাকিয়ে চেরা গলায় বললেন, ‘চিনতে পারছেন আমাকে ?’

“ভদ্রলোককে আসতে দেখেই আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘আসুন, আসুন। কেমন আছেন ?’

“চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে কালীকিঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার পাখি দেখা কেমন চলছে ?’

“ভদ্রলোক বহুদিন রাঁচিতে আছেন। ছোটনাগপুরের এই অঞ্চলের পাখিদের সম্পর্কে সবরকম খবর ভদ্রলোকের নখদর্পণে।

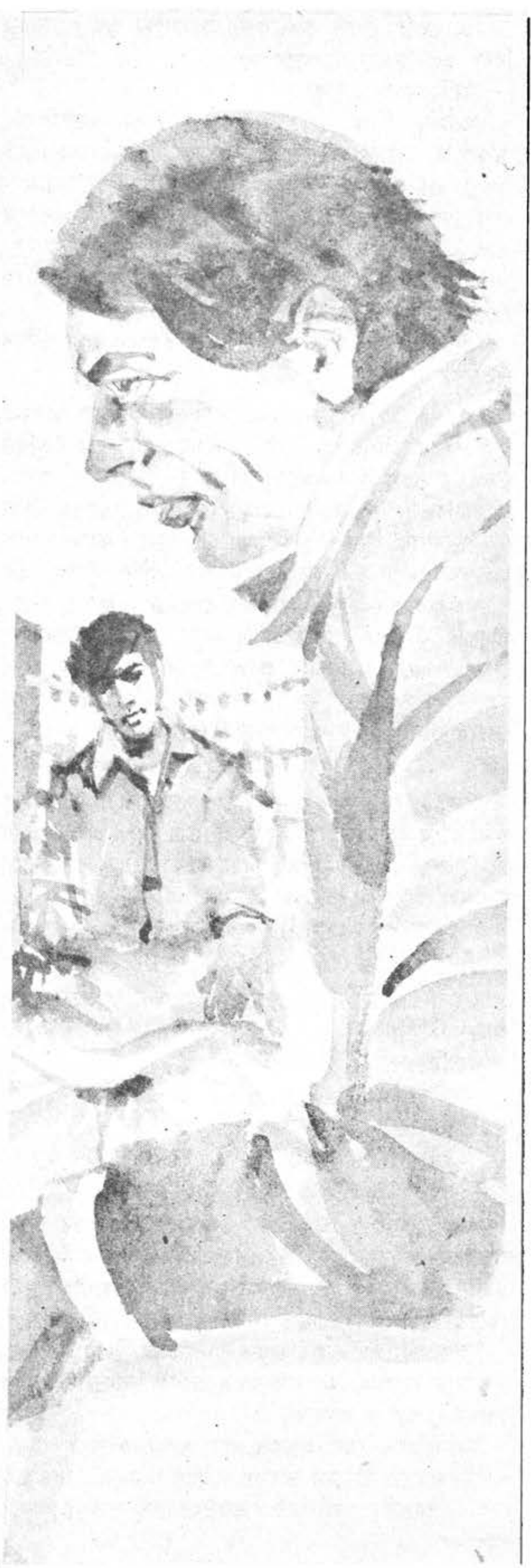

"চা খেতে খেতে কালীকিঙ্কর জানালেন ওঁর গবেষণার বিষয় হল কর্ভাস ম্যাকরোরিঙ্কস।

"আমি বললাম, 'কাক।'

"আমার দিকে চেয়ে, হেসে বললেন কালীকিঙ্কর, 'দাঁড়কাক।' তারপর চায়ে একটা চুমুক দিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'শুধু কাক বললে কিছুই বোঝানো হল না। কাক তো কত রকমই হতে পারে। কী কাক ? কোথাকার কাক ? কাক বলতে ঠিক কী বুঝি আমরা ? প্যারাডাইজ্ ক্রো কিংবা কারাওয়ং অর্থাৎ পাইপিং ক্রো, কোক্যাবো বা ওয়্টল্ড্ ক্রো, এদের কি আপনি কাক বলবেন ?'

"আমি কোনও কথা না বলে কালীকিঙ্করের কথা শুনতে লাগলাম।

"কালীকিঙ্কর বলে চললেন, 'কাক হতে গেলে প্রথমত করভিডি ফ্যামিলির হতে হবে। প্যাসিফর্মেস্ অর্ডার। কুড়ির বেশি জাতের কাক আছে পৃথিবীতে, জানেন ? কর্ভাস ব্র্যাকাইরিঙ্কস্। নর্থ অ্যামেরিকায় পাওয়া যায়। হুডেড্ ক্রোর নাম শুনেছেন, যাকে অনেক সময় হুডি বলে ? কালোর সঙ্গে ছাই-ছাই মেশানো। কর্ভাস কর্নিক্স্। ব্রিটিশ আইল্স্-এর পাখি। কর্ভাস কোরন্। ক্যারিয়ান্ ক্রো। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন কী খায়। মৃত প্রাণীর মাংস। পশ্চিম ইউরোপে দেখতে পাবেন। কর্ভাস অ্যাল্বাস্, কর্ভাস্ কেলি, ফিশ্ ক্রো—কর্ভাস্ অসিফ্র্যাগাস্। আর কর্ভাস্ স্প্লেনডেন্স্ মানে তো জানেনই। এই আশেপাশেই আছে কোথাও। হাউজ্ ক্রো।'

"সেই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ল, বারান্দার একটা থামকে জড়িয়ে যে বুগেন্ভিলিয়াটা উঠেছে, তার ডালে এক-একবার এসে বসছে এবং পরমুহূর্তেই উত্তেজিতভাবে ওড়াউড়ি করছে বারান্দার আশেপাশে একটা পাখি।

"আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে কালীকিঙ্করও দেখেছেন পাখিটাকে।

"চেরা গলায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'ডিক্রু রাস্ অ্যাড্সিমিলিস্।'

"আমি বললাম, 'ফিঙে।'

"কালীকিঙ্কর পাখিটাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'এর স্বভাবের একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন ?'

"আমি বললাম, 'আ স্ট্রং অ্যান্টি ক্রো ইন্স্টিঙ্কট্। কাকের সঙ্গে এর সাপে-নেউলে সম্পর্ক।'

"কালীকিঙ্করের চোখ দুটো, আমার একমুহূর্তের জন্যে মনে হল, চকচক করে উঠল। বাকি সময়টা কালীকিঙ্কর একরকম অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। আমার কথাবার্তার কিছুটা অসংলগ্ন জবাব দিতে দিতে শেষকালে বলেন, 'উঠি আজ।'

"বাগানের গেটের কাছ থেকে কালীকিঙ্কর বিদায় নিলেন।

"আমি বললাম, 'আপনার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং খবর পেলাম। আবার আসবেন।'

"কালীকিঙ্কর সেই অন্ধকার-নামা বাগানের দিকে চেয়ে, অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেন, 'আসতেই হবে। আপনার বাগানের ওয়াইল্ড্লাইফ পপুলেশান্টা চমৎকার।'

"একজন অরনিথলজিস্টের পক্ষে এ-কথা বলাটা আশ্চর্য নয়। তবু কেন জানি না আমার গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল।"

দাদামশাইয়ের ডায়েরি থেকে—৪

"এই জায়গাটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বনজঙ্গলের ভেতর একটা ছোট্ট ঘুমজড়ানো রেলওয়ে স্টেশান্ ছিল। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা মিলিটারি ক্যাম্প ছিল বলে সারাদিনে মাত্র কয়েকবার ট্রেন থাকত। তখনও এখানে চেঞ্জারদের ভিড় শুরু হয়নি।

"সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়রের সময় কলকাতা ছেড়ে লোকে ছোটনাগপুর আর সাঁওতাল পরগনার স্টেশানগুলোয় চলে আসতে শুরু করে। এই জায়গাটাতে সেই সময় বাড়ি করে অনেকে চলে আসে।

"অনেক বাড়িই সারা বছর তালাবন্ধ পড়ে থাকে। পুজো থেকে শুরু করে শীতের শেষ পর্যন্ত লোকে বেড়াতে আসে। যারা এখানে থেকে গেছে, তাদের বেশির ভাগেরই রিটায়ার্ড লাইফ। আমার বন্ধু সুনির্মলবাবু ডিস্ট্রিক্ট জাজ ছিলেন। রিটায়ার করার পর এখানে চলে এসেছেন। বাগানের শখ। এখন সিজ্ন্ ফ্লাওয়ার নিয়ে ব্যস্ত। তা ছাড়া সুনির্মলবাবুর একটা চমৎকার লাইব্রেরি আছে। এত পড়াশুনো, অজস্র বিষয়ে আগ্রহ খুব বেশি দেখা যায় না।

"সুনির্মলবাবুকে কালীকিঙ্কর চক্রবর্তীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। এখানে ওই নামের বা চেহারার কাউকে উনি চেনেন না বললেন। এরকম ছোট জায়গায় প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। আমি রুক'স নেস্ট-এর উল্লেখ করায় বললেন, 'কবরখানার দিকটায় তো ? বাড়িটা বাইরে থেকে দেখেছি। খুব পুরনো বাড়ি। কোনও সাহেবের ছিল সম্ভবত। তবে বাড়িটার যেরকম চেহারা, তাতে করে কেউ থাকে বলে মনে হওয়ার কথা নয়। বাগানটা দেখেছেন ? একেবারে জঙ্গল হয়ে গেছে। কী নাম বললেন ভদ্রলোকের ?'

"আমি নামটা বললাম। তাতে সুনির্মলবাবুকে হঠাৎ কীরকম অন্যমনস্ক দেখাল।

"'অরনিথলজিস্ট ? কাক নিয়ে রিসার্চ করেন ? কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী ?' সুনির্মলবাবু কথাগুলো নিজের মনে বিড় বিড় করে বলে, কিছু মনে করার চেষ্টা করে মনে করতে না পেরে হতাশ হয়ে বললেন, 'মেমরিটা আজকাল আর আগের মতো নেই। হার্ট আর ব্রেইনের সেল্স্গুলো আর নতুন করে গ্রো করে না, জানেন তো ? একবার ফুরিয়ে আসতে শুরু করলে তখন শুধুই ডাউন্হিল।'"

দাদামশাইয়ের ডায়েরি থেকে—৫

"একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে চারিদিকে নির্জন প্রকৃতির ওপর অন্ধকার নামা দেখতে দেখতে আমার মনে হল, এই দিন শেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা দারুণ দুঃখ লুকিয়ে থাকে। মনে হয়, এই আকাশ, এই পৃথিবীর জীবন আমাদের থেকে কত লম্বা। কত কোটি কোটি বছরের জীবন। আর আমাদের জীবন কী ছোট ছোট। অথচ কী দামি, মাত্র একবারই পাওয়া যায়। অথচ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই দামি জীবনের একদিন কমে যায়। পাখিদের জীবন থেকে, জোনাকির জীবন থেকে, ঝিঁঝিপোকাদের, খরগোশের, আমাদেরও।

"কিংবা, একটা দিন, সেই একটা দিন, ভোরবেলায় ঘুম

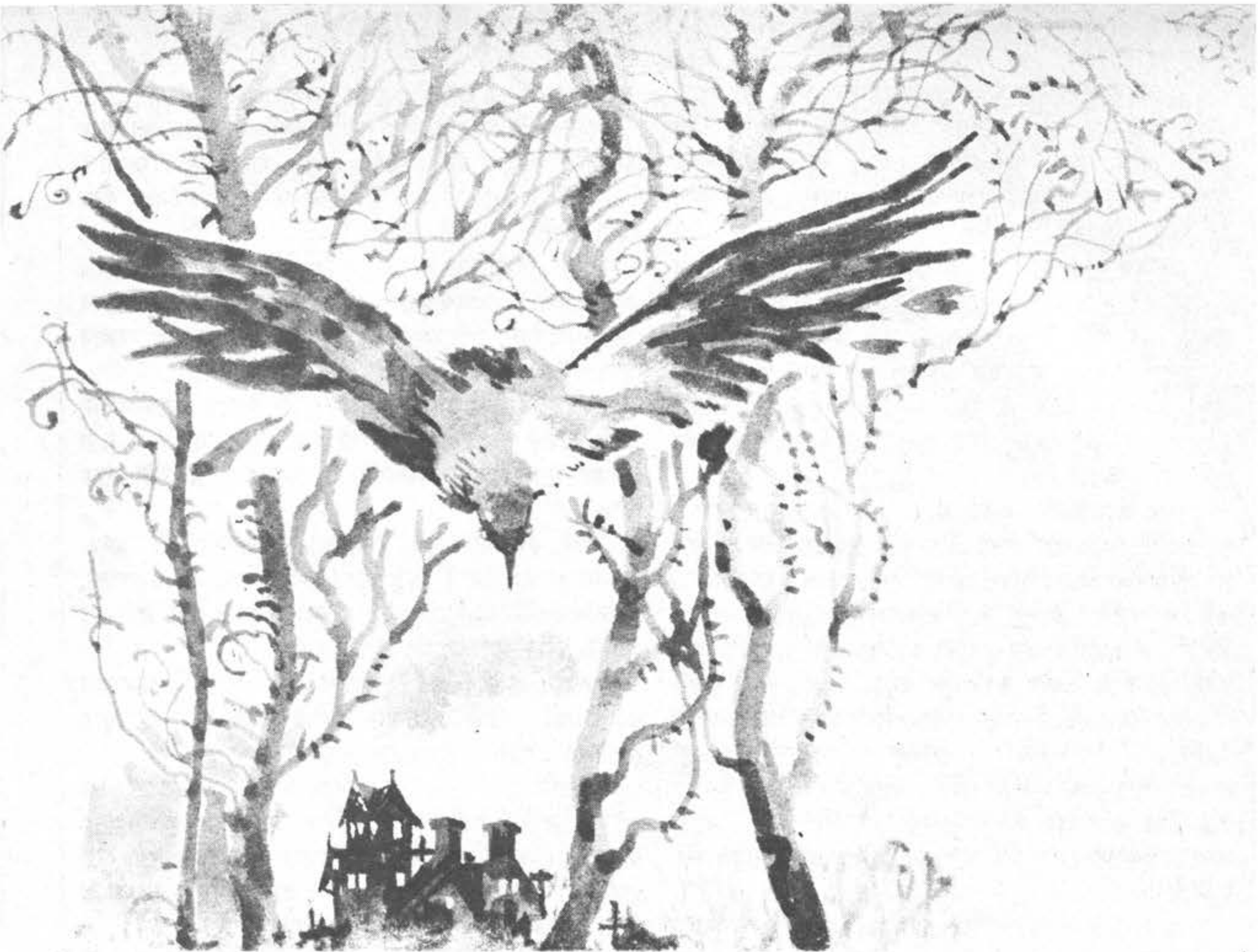

ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যে-দিনটা শুরু হয়েছিল, সেই দিনটা সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে মরে যায়, কত কোটি কোটি বছরের সময়ের অন্ধকার রাত্রির ভেতর, ভুলে যাওয়ার ভেতর, হারিয়ে যায়। আর কখনও পাওয়া যায় না।

"রাত্রির সঙ্গে-সঙ্গে সেই কুয়াশা-নামা-প্রান্তরে এক অপার্থিব অন্য পৃথিবীর মতো চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সিলুয়েটেড্ গাছেদের ফাঁক দিয়ে গোল চাঁদটাকে এখন বেশ নীচের আকাশে দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই উঠে আসবে ওপরে। এখন হলুদ। এরপর ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় ভরে যাবে।

"একরম হুহু করা মাঠে, কুয়াশায়, জ্যোৎস্নার ভেতর এসে দাঁড়ালে এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, মৃত অশরীরীদের যেন তাদের ঘাসের নীচে, মাটির তলায় বরফের মতো অন্ধকার বিস্মৃত কবর থেকে উঠে এসে এই সাদা রাজহাঁসের মতো জ্যোৎস্নায় পা টিপে টিপে হেঁটে বেড়াবার কথা ছিল।

"দূরে নির্জন মাঠের ভেতর একটা মাত্র গাছপালায় ঘেরা বাড়ি। আমি দূরবিনের ভেতর দিয়ে তাকাতেই সিলুয়েটেড্ রুক'স নেস্ট হঠাৎ যেন একটা অপরিচিত, অতিপ্রাকৃত স্বপ্নের মতো দৃষ্টির সীমা জুড়ে ভেসে উঠল। চারদিকে কুয়াশা। সেই কুয়াশায়, হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে সেই শীতার্ত প্রায়ান্ধকারে রুক'স নেস্ট-এর কম্পাউণ্ডের পাতা-ঝরে-যাওয়া গাছেদের ডালপালাকে যেন অজস্র প্রাগৈতিহাসিক পাখির কঙ্কালের ফসিলের মতো মনে হল। অজস্র হিংস্র ঠোঁট, এবং সংখ্যাহীন পায়ের অগণিত আঙুলের বাঁকানো, ধারালো নখ। প্রকাণ্ড ডানার কাঠামো আর বিশাল বুকের পাঁজরগুলো যেন কোনও ভয়ঙ্কর খাঁচার মতো।

"যেন অতীত থেকে উঠে এসে একদল প্রাগৈতিহাসিক পাখি রুক'স নেস্ট-এর পরিত্যক্ত, অন্ধকার জনপ্রাণিহীন কোটরে বাসা করেছে।

"এইসময় হঠাৎ সেই গাছপালার ভেতর থেকে দুটো বিশাল কালো ডানা বেরিয়ে এসে সেই চাঁদের আলোয় উড়তে উড়তে আমার দৃষ্টির সীমার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"ডানার ছেঁড়া-ছেঁড়া প্রান্ত এবং ওড়ার ভঙ্গিটা থেকে প্রাণীটিকে চিনতে আমার অসুবিধে হল না। যেটা বুঝতে পারলাম না, তা হল, কাক নিশাচর পাখি নয়, তা সত্ত্বেও এই রাতচরা পাখির মতো আচরণের ব্যাপারটা।

"আমি ঠিক করলাম, একদিন কালীকিঙ্করকে এ-ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে হবে।

"সে-রাতে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। জেগে-জেগে রাতের নিজস্ব সব শব্দ শুনছি। কোথায় একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল। খুটখুট আওয়াজ শোনা গেল। একটা রাতচরা পাখি হঠাৎ ভয় পাইয়ে দেওয়া গলায় ডেকে উঠল কোথাও। চারিদিক জুড়ে ঝিঁঝির ডাক। রেলগাড়ির গুমগুম শব্দ শোনা গেল অনেক দূর থেকে। সেই সঙ্গে মন কেমন করানো হুইস্‌ল্।

"অন্ধকারের ভেতর, নৈঃশব্দ্যের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া রেলগাড়ির কথা ভাবলেই কেন জানি না ভীষণ দুঃখ হয়। অকারণ, অযথা দুঃখ। এই মুহূর্তের রেলগাড়ির এইসব লোকেরা কে কোথায় কতদূরে কোন্ আলো-ঝলমল স্টেশানে হারিয়ে যাবে, সেইজন্যে দুঃখ। রেলগাড়িতে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে কত সময়, কত কিছু, কত কেউ হারিয়ে যায়, সেই জন্যে

দুঃখ। ওই রেলগাড়িটা চলে গেলে আমার জন্যে শুধু পড়ে থাকবে অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্য। আর অন্য কোথাও অন্য কারও জন্যে তখন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সারি-সারি কম্পার্টমেন্টের জানলার আলো আর হুহু দীর্ঘশ্বাস-ফেলা শব্দ, সেই জন্যে দুঃখ।

“জ্যোৎস্নার প্রান্তরে রাতের রেলগাড়ির মতো আমাদের জীবনে এই খালি খালি সরে যাওয়া, চলে যাওয়া, ফেলে যাওয়া, এই খালি-খালি হারিয়ে ফেলার কথা ভেবে দুঃখ।

“হঠাৎ একসময় মনে হল, এই সব শব্দ ছাড়াও আর একটা শব্দ ক্রমশই জেগে উঠছে, চারিদিক জুড়ে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকে ভুল করে ভোর ভেবে কাকেরা জেগে উঠে ডাকাডাকি করছে।

“শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলাম, ছোটবেলায় কোনও কোনও রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে চোখ খুলে দেখতাম জানলা দিয়ে চাঁদের আলো আমার মুখের ওপর এসে পড়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরের আকাশে চাঁদের দিকে তাকালে চোখ কুঁচকে যেত। চাঁদটা যেন একটা হাজার ওয়টের আলোর মতো সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীকে একটা রূপকথার মতো সুন্দর, ঘুমন্ত দুর্গের বাগানের ঝিলে ভেসে-বেড়ানো রাজহাঁসের মতো কিংবা একটা অলৌকিক স্বপ্নের ভেতর ভেসে ওঠা এপার-ওপার-দেখা-যায়-না নদীর বালির চরের ওপর ঘাসের বনে উড়ে-এসে-বসা অজস্র লেসার হুইস্‌লিং টিলের মতো অস্পষ্ট অশরীরী সৌন্দর্যের ফিল্টারে তোলা একটা দারুণ ছবি বানিয়ে দিয়েছে।

“আমি উঠে ওভারকোটটা চাপিয়ে দরজা খুলে বাইরে বাগানে বেরিয়ে এলাম। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বাগানটাও বদলে গেছে। কীরকম অচেনা মনে হল বাগানটাকে। বাইরে অপার্থিব জ্যোৎস্না। গাছপালার ভেতর থেকে কাকেরা বেরিয়ে এসে সেই অলৌকিক আকাশে এলোমেলো ওড়াউড়ি করছে। চারিদিক থেকে কাকেদের একটা সম্মিলিত কা-কা চিৎকারে হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে গা ছমছম করে উঠল আমার।

“বাগানের ঘাসের ওপর উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে আমার মনে হতে লাগল, আমি কি সত্যি সত্যি জেগে আছি, অথবা স্বপ্নের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছি। কিংবা হয়তো চাঁদের আলোয় পাগল হয়ে গেছি আমি। চাঁদের সঙ্গে আমাদের আচরণের কী একটা অদৃশ্য যোগাযোগ আছে।

“হঠাৎ আমার পায়ের পাতার ওপর দিয়ে একটা কোনও প্রাণী ছিটকে বেরিয়ে গেল। কিচ কিচ ডাক শোনা গেল ঝোপ্‌-ঝাড়ের ভেতর। সচেতন হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আমি বিস্ময়ে আঁতকে উঠলাম।

“ঝোপের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোচ্ছেন কালীকিঙ্কর। একটা শীর্ণ, দীর্ঘ, কঙ্কালসার ছায়ার মতো।

“আমাকে প্রথমটা দেখতে পাননি ভদ্রলোক। মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন কালীকিঙ্কর। অসংলগ্নভাবে বললেন, ‘মর্নিং ওয়াক্‌-এ বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।’

“এখন মাঝরাত, আমি এ-কথা জানাতে অপ্রস্তুতভাবে নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন, ‘মাঝরাত ? তা হবে। আমার মনে হয়েছিল ভোর হয়ে গেছে।’

“বিদায় নিয়ে চলে গেলেন কালীকিঙ্কর।

“হঠাৎ কী মনে হওয়ায় আমি দূরবিনটা নিয়ে জানলায় এসে দাঁড়ালাম। কালীকিঙ্কর কোথায় যান দেখার জন্যে।

“সেই জ্যোৎস্নায়, কুয়াশায় মাঠের ভেতর দিয়ে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলেছেন কালীকিঙ্কর।

“হঠাৎ কালীকিঙ্করের একটা কথা আমার মনে পড়ল। কালীকিঙ্কর অন্যমনস্কভাবে বলেছিলেন, ‘আপনার বাগানের ওয়াইল্ডলাইফ পপুলেশানটা চমৎকার। আমাকে আবার আসতেই হবে।’

“যদিও কালীকিঙ্কর সেদিন ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন, সেটা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়, তবু একটা কথা মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কেন জানি না, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

“কালীকিঙ্করের একটা সেকেণ্ডারি পার্সোন্যালিটি আছে, আমার সন্দেহ হল। কিন্তু গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার কারণ, পার্সোন্যালিটিটা মানুষের নয়। অন্য আর-একটি প্রাণীর। প্রাণীটি কর্ভাস জিনাসের অন্তর্গত।

“রুক’স নেস্ট-এর কাছাকাছি পৌঁছে থামলেন কালীকিঙ্কর। তারপর সামনের গেট দিয়ে না ঢুকে, ঘুরে বাগানের পেছন দিকে এসে দাঁড়ালেন।

“পিকেট ফেন্‌স-এর ফাঁক দিয়ে নিচু হয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন কালীকিঙ্কর। বাড়ির দিকে না গিয়ে কালীকিঙ্কর বাগানের পেছন দিকের অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কালীকিঙ্করকে সে-রাতে আর জঙ্গল থেকে বেরোতে দেখলাম না।

“এত রাতে কালীকিঙ্কর একা-একা জঙ্গলের ভেতর কী করতে পারেন, সেটা আমার কাছে দুর্বোধ মনে হল।”

দাদামশাইয়ের ডায়েরি থেকে—৬

“বিকেলে বেড়িয়ে ফেরার সময় রুক’স নেস্ট-এর সামনে দিয়ে আসতে আসতে অন্ধকার-নামা জঙ্গল-হয়ে-যাওয়া বাগানটার লোহার গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কালীকিঙ্করকে দেখা গেল, অন্ধকারে বাগানের ঝোপ্‌ঝাড়ের ভেতর, মাটিতে ইঁদুরের গর্তের আশেপাশে মরা ব্যাং, মেঠো ইঁদুর কিংবা শজারুর সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে সেই অস্বাভাবিক চেরা গলায় বললেন, ‘ফিরছেন ? চলুন, আমিও একটু বেরোব।’

“কালীকিঙ্করের কাছে আজ এই প্রথম আমি নিজে থেকে তাঁর রিসার্চ সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে এ-বিষয়ে জানতে চাইলাম। কতগুলো কথা আমার জানার দরকার ছিল।

“হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কালীকিঙ্কর বললেন, ‘ক্ষমা করবেন। আমার রিসার্চ-এর বিষয়ে আমি কারও সঙ্গে আলোচনা করি না।’

“কালীকিঙ্করের এই নিজেকে হঠাৎ গুটিয়ে নেওয়ার কারণ বুঝতে না পারলেও আমি আর এ নিয়ে তাঁকে কোনও অনুরোধ করলাম না।

“কালীকিঙ্কর বাকি পথটা আর কোনও কথা বলেননি। একসময় আমার কাছে বিদায় নিয়ে, যে রাস্তাটা কবরখানার দিকে গেছে সেটা ধরে চলে গেলেন।

“সুনির্মলবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম,

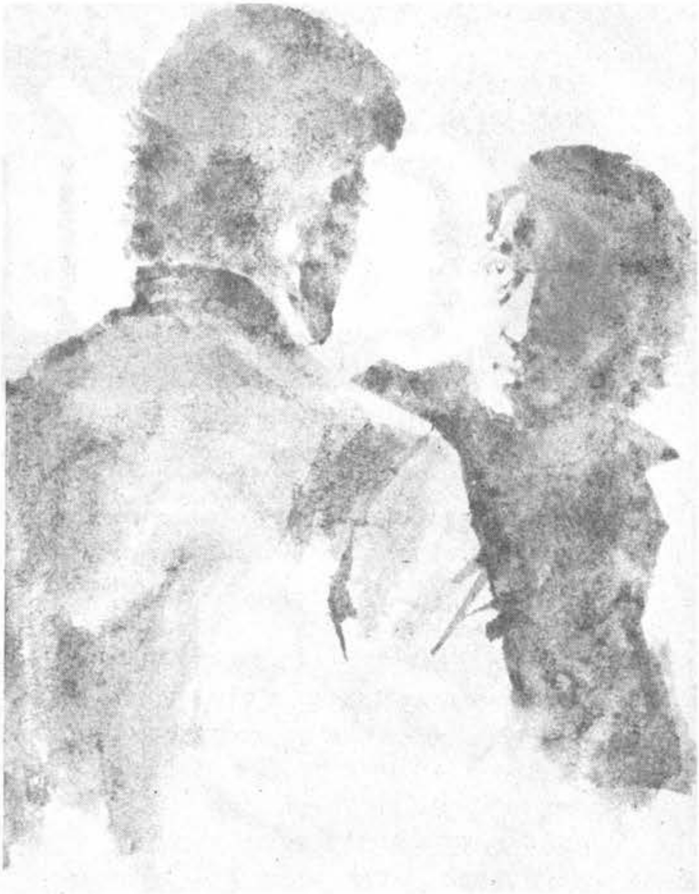

বারান্দার বাইরের দিকের কাঁচের শেডের আলোটা জ্বলে উঠেছে । তখনও মালিকে নিয়ে বাগানে কাজ করছেন সুনির্মলবাবু । আমি এসে পড়ায় আজকের মতো বাগানের কাজ শেষ করে 'চা' 'চা' করে হৈহৈ লাগিয়ে দিলেন ।

“বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিলে বসে চা খেতে খেতে সুনির্মলবাবুকে কালীকিঙ্কর সম্পর্কে সব কথা গোড়া থেকে শুরু করে বললাম । গত রাতের ঘটনার কথা বলা শেষ করে আমার নিজের ধারণাটার কথাও জানালাম ।

“সুনির্মলবাবু একটু অন্যমনস্কভাবে কিছু ভাবতে ভাবতে বললেন, 'অসম্ভব নয় । কতকগুলো অ্যাকোয়্যার্ড বিহেভিয়ার তো থাকেই সকলের ভেতর । আমাদের জ্ঞানার্জনের পুরো ব্যাপারটাই তো অ্যাকোয়্যার্ড বিহেভিয়ার । একটা ভাষা শেখার কথাই ধরুন না । ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ব্যাপারে পরিবেশও একটা অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর । নেকড়েদের মধ্যে মানুষ হয়ে নেকড়ের স্বভাব পেয়ে যাওয়ার ঘটনা তো কাগজে মাঝে-মাঝেই বেরোয় । তেমনি কাকেদের সঙ্গে থাকতে-থাকতে কাকের স্বভাব তৈরি হয়ে যাওয়া...' কথাটা শেষ না করে সুনির্মলবাবু আবার অন্যমনস্ক হয়ে স্মৃতি হাতড়াতে লাগলেন । দেওয়ালের ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলল । বাইরে কোথায় একটা রাতচরা পাখি কট্ কট্ করে চট্‌পটি বাজানোর মতো আওয়াজে ডেকে উঠল । সুনির্মলবাবুর কুকুরটা ঘরে ঢুকে একটা টেবিলের নীচে গুঁড়িসুড়ি মেরে ঝুপ করে নিঝ্ঝুম হয়ে শুয়ে পড়ল । সুনির্মলবাবু একবার শুধু বললেন, 'কালীকিঙ্কর নামটা কোথাও পেয়েছিলাম মনে হচ্ছে । কোনও একটা ঘটনা । যতদূর মনে পড়ছে, সে-ও অরনিথলজিস্ট ছিল ।'

“বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলা বাইরের ঘরে বসে ফায়ারপ্লেসের আলোয় ডায়েরি লিখছিলাম । ঝিঁঝি ডাকছে ঝিম-ঝিম করে । বাইরে বারান্দায় একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে । জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার বাগানের ভেতর দূরে রান্নাঘরে আলো জ্বলছে । চৌকিদার রান্না করছে । বাগানের মোরাম-বিছানো রাস্তায় মচমচ শব্দ করে একটা কুকুর দৌড়ে গেল । ঘেউ-ঘেউ ডাক শোনা গেল ।

“এমন সময় বন্ধ দরজায় কেউ টকটক আওয়াজ করল । দরজার ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে একজন মানুষের আউটলাইন ঝাপ্‌সা দেখা গেল ।

“আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখলাম বারান্দার মিটমিটে আলোয় কালীকিঙ্কর দাঁড়িয়ে আছেন । বললেন, 'আপনাকে একটা কথা জানানোর প্রয়োজন বোধ করে আসতে হল । বিরক্ত করলাম অসময়ে ?'

“'একেবারেই না । আসুন । ভেতরে আসুন ।'

“ফায়ারপ্লেসের আলোর বিপরীতে বসেছেন কালীকিঙ্কর । মুখের একটা ধারে আলো এসে পড়েছে । বাকিটা অন্ধকার । সেই অন্ধকার অংশের ভেতর চোখের সাদাটা শুধু বোঝা যাচ্ছে । 'একটা ফাইল আপনাকে দিতে চাই ।'

“'কিসের ফাইল ?'

“'আমার রিসার্চ ।'

“আমি চমকে উঠলাম । সেটা লক্ষ করেই আবার বললেন কালীকিঙ্কর, 'এই কথাটা বলতেই এলাম ।'

“তারপর ফায়ারপ্লেসের আগুনটার দিকে চেয়ে অনেকটা নিজের মনে বললেন, 'ডিজনেস্ট্ মানুষদের কাছ থেকে বাঁচিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারলেও উইপোকার হাত থেকে বাঁচানো আর বোধহয় বেশিদিন সম্ভব হবে না ।'

“এই সময় চৌকিদার এসে জানাল রান্না হয়ে গেছে । আমি কালীকিঙ্করকে খেতে অনুরোধ করতে তিনি রাজি হয়ে গেলেন ।

'টেবিলের অপর প্রান্তে বসে খুব মন দিয়ে খাবারগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুরগি খান তো ?'

“কালীকিঙ্কর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার সব মাংসই চলে ।' তারপর একটু থেমে, কী ভেবে বললেন, 'তবে কাকের মাংসটা তত পছন্দ করি না ।'

“আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল । প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার রিসার্চ-এর সাবজেক্টটা কী ?'

“কালীকিঙ্কর, হঠাৎ আমার এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল, যেন আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে, বললেন, 'ভায়লেন্স্ ।'

“কালীকিঙ্কর বলতে লাগলেন, 'প্রাণীদের মধ্যে এ জিনিসটার কোনও অভাব নেই । আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি দে আর অ্যাবসলুট্‌লি রেড ইন টুথ অ্যাণ্ড ক্ল ।' তারপর এক মুহূর্ত চুপ্ করে থেকে অন্যমনস্কভাবে, যেন কী ভাবতে ভাবতে, নিজের মনেই বললেন, 'কিংবা ইন বিক অ্যাণ্ড ক্ল ।'

“বাইরে রাত ঝিমঝিম করছে । চৌকিদার, বোধহয় কিছু আনতে, বাগান পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেছে । একটা কালো রঙের, বোধহয় চৌকিদারের পোষা বেড়াল, খুব চাপা গলায়

ক্যাডবেরি'স্

বোর্নভিটা

শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক!

"আমি আমার বাচ্চাদের, এক কাপ দুধে দু'চামচ করে পুষ্টিগুণ ও আস্বাদেভরা পানীয় বোর্নভিটা, দিনে দু'বার ক'রে দিই।

বোর্নভিটা থেকে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টি পায় বলে আমার বাচ্চারা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি যথাযথভাবে পায়— তাইতো, পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হ'বেই খাওয়াতে।"

MILK
Cadbury's
Bournvita
NOW SAVE Rs.2/-
SUGAR
MALT
COCOA

এটি বোর্নভিটা ভরা বর্ষ.
যার জন্য এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.

এবার প্রতি ৫০০ গ্রাঃ রিফিল প্যাকের ওপর ২ টাকা বাঁচান।

OBM/4688/BEN

বাইরে থেকে কয়েকবার ডেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে পা টিপে ঘরে ঢুকে চৌকাঠের কাছ থেকে দুটো হলুদ জ্বলজ্বলে চোখে আমাদের দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে চেয়ে থেকে পা টিপে-টিপে একটা কোনায় গিয়ে বসে পড়ল। তারপর সেখান থেকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।

"খাচ্ছেন কালীকিঙ্কর। আমরা যেমন হাত দিয়ে খাবার মুখের কাছে তুলে আনি, সেরকমভাবে নয়। মুখটাকে নিয়ে যাচ্ছেন খাবারের ওপর। দু'হাতে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে মাংস ছিড়ছেন। ঠিক কাকের মতো করে।

"দেখতে দেখতে আমি খাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। কালীকিঙ্কর আমার বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ করেননি। মাংস চিবোনোর ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগলেন, 'ভায়লেন্স ব্যাপারটা সব প্রাণীর ভেতরেই আছে। আমি দেখতে চাইছিলাম স্পেস অর্থাৎ স্থান বা জায়গা আর ভায়লেন্স, এই দুটোর প্রথমটা কমলে দ্বিতীয়টা বাড়ে কি না। যে-কোনও একটা শহরের কথা ধরা যাক। মাইগ্রেশানের ফলে যদি ক্রমাগত একটা শহরের পপুলেশান এবং তার ফলে কন্‌জেসচন বাড়তে থাকে, তা হলে মানুষের জন্যে এভেলেব্‌ল্ স্পেস্ কমতে কমতে একটা পয়েন্ট আসবে, যখন সেই শহরের ভায়লেন্স লেভেলটাও ক্রমশ বাড়তে শুরু করবে। এইটা ছিল আমার হাইপথিসিস্।'

"আমি নিঃশব্দে কালীকিঙ্করের কথা শুনছিলাম। 'আমার গবেষণার জন্যে আমি মানুষের সাব্‌স্টিটিউট হিসেবে যে প্রাণীটিকে বেছে নিয়েছিলাম, তার নাম কর্ভাস্ ম্যাক্‌রোরিঙ্কস্।'

"বলে মৃদু হাসলেন কালীকিঙ্কর। 'অর্থাৎ দাঁড়কাক। কাকেরা মানুষের মতোই সমাজবদ্ধ গ্রিগেরিয়াস প্রাণী। তাই মানুষের বদলে দাঁড়কাকদের বিহেভিয়ার অব্‌জার্ভ করার কথা মনে হয়েছিল।'

"খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। উঠে পড়লাম আমরা। দেয়ালের ঘড়িতে তখন ন'টা বাজছে।

"ড্রইংরুমের ভেতর দিয়ে হেঁটে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন কালীকিঙ্কর। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার থিওরিতে কোনও ভুল ছিল না। শুধু আমি প্রমাণ করতে পারছিলাম না।'

"আমি বললাম, 'কী?'

"ওভারক্রাওডিং যে সত্যি-সত্যিই কোনও প্রাণীকে হিংস্র করে তুলতে পারে, এই সত্যিটা।'

"'শেষ অবধি প্রমাণ পেয়েছিলেন?'

"ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন কালীকিঙ্কর, 'পেয়েছিলাম।'

"তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'এভিয়ারির ভেতর ঢুকে হাতে করে খাবার দেওয়ার সময় যেদিন খাবারের সঙ্গে আমার হাতের পাতা থেকে খানিকটা মাংস উধাও হয়ে গেল, সেদিনই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

"একটু ম্লান হেসে বললেন কালীকিঙ্কর, 'আফ্‌টার অল, টেরোড্যাকটিলের বংশধর তো।'

"দরজাটা খুলে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন কালীকিঙ্কর। 'আমার ডায়েরিতে পাখিগুলোর প্রতিদিনের বিহেভিয়ারের বিস্তারিত বিবরণ পাবেন।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'শুধু একটা বিহেভিয়ার ছাড়া। সেটা লিখে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

"বাইরের অন্ধকারে মিশে গেলেন কালীকিঙ্কর।

"কালীকিঙ্কর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সুনির্মলবাবুর বাড়ি থেকে একজন লোক একটা চিঠি দিয়ে গেল।

"সুনির্মলবাবু লিখেছেন, 'আপনার কাছে কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী নামটা শোনার পর থেকেই একটা চাপা অস্বস্তি হচ্ছিল। নামটা কোথায় যেন শুনেছি, অথচ ঠিক কোথায় কী কন্‌টেক্‌স্ট-এ মনে পড়ছিল না। শেষ পর্যন্ত লাইব্রেরির বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে পেয়ে গেলাম। কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী নামে নাইন্টিন্‌থ সেঞ্চুরির শেষ এবং এই সেঞ্চুরির গোড়ার দিকের এক অব্‌স্কিওর অরনিথলজিস্ট-এর সম্পর্কে সামান্য যা তথ্য পাওয়া যায়, তা হল ভদ্রলোক পনেরো বছর ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে এসে অজ্ঞাতবাসে থেকে সে-যুগের ধারণায় উদ্ভট এক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন।

"'ইংল্যাণ্ডে গবেষণার সময় ভদ্রলোক একটা আঘাত পান। এক বন্ধুর সঙ্গে একটা প্রজেক্ট প্রায় শেষ করে আনার মাস তিনেক আগেই ছেলেটি তার নিজের নামে একটা আর্টিক্‌ল পাব্‌লিশ করে ফেলে। এই বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে কালীকিঙ্কর ছোটনাগপুরের কোনও একটা জনবসতিহীন অঞ্চলে খুব গোপনে কোনও একটা গবেষণা শুরু করেছিলেন। শুধু মাঝে-মাঝে বাইরের কোনও কোনও সায়েন্টিফিক্ জার্নালে তাঁর এক-একটা আর্টিক্‌ল্ দেখা যেত।

"'সেইসব লেখা থেকে মনে হয় একধরনের ইথলজি নিয়ে গবেষণা করছিলেন কালীকিঙ্কর। তাঁর ধারণাকে সে-যুগে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কারণ কালীকিঙ্কর মনে করতেন, মানুষের

বিহেভিয়ারের একটা অংশ অন্য যে-কোনও প্রাণীর বিহেভিয়ারের মতোই। মানুষকে নিয়ে যেখানে কোনও কনট্রোল্ড্ এক্স্পেরিমেন্ট করা সম্ভব নয়, সেখানে অন্য কোনও প্রাণীকে নিয়ে এরকম একটা এক্স্পেরিমেন্ট করে অনুরূপ অবস্থায় মানুষের বিহেভিয়ার কীরকম হতে পারে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। তা কালীকিঙ্করের এ-সব কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি, তার কারণ প্রমাণের অভাব।

"'কালীকিঙ্করকে মনে রাখার কোনও কারণই থাকত না, যদি না এখনকার ইথলজিস্টরা ইণ্ডিয়ান ইথলজির ইতিহাস লেখার জন্যে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পুরনো পত্রিকার হলুদ হয়ে যাওয়া পাতায় এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর লেখা আবিষ্কার করতেন।

"চিঠির শেষে সুনির্মলবাবু আর একটা কথা লিখেছেন। 'কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী সম্পর্কে সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপারটা হল, ভদ্রলোকের অন্তর্হিত হয়ে যাওয়াটা। উনিশশো পাঁচ কি ছয় সালে ছোটনাগপুরের জনবসতিহীন কোনও দুর্গম জায়গায় যতটা তদন্ত হওয়া সম্ভব ছিল, তা হয়তো হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের কোনও খোঁজ আর কখনও পাওয়া যায়নি।'"

দাদামশাইয়ের ডায়েরি থেকে—৭

"ট্রেন থেকে নেমেই একটা টাঙ্গা নিলাম। তখন শীতের বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। চারিদিক ক্রমশ ধোঁয়ায়, কুয়াশায়, অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে আসছে। কাঁচা রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ আর টাঙ্গার একটা একটানা ঝাঁকুনি।

"রাঁচির সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিস আমার বন্ধু। তার সঙ্গে কথা বলতে রাঁচি শহরে গিয়েছিলাম। কালীকিঙ্করের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বিষয়ে যা খবর পেলাম, তা হল, উনিশশো ছয় সালে এখান থেকে দশ মাইলের ভেতর কোনও পুলিশ-স্টেশান ছিল না। কোনও এফ· আই· আর যদি করা হয়েও থাকে সেই সময়ে, তা হলেও পুলিসের কোনও টিম অতদূরে ইন্‌ভেস্টিগেশানে গিয়েছিল বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক একা-একা বনে-জঙ্গলে পাখির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন শুনেই সম্ভবত তারা এটাকে নেকড়ে বাঘের আক্রমণের ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়েছিল।

"টাঙ্গাটা রুক'স নেস্ট-এর গেটের বাইরে এসে থেমে গেল।

"বাড়িটার পেছন দিকে কম্পাউণ্ডের ভেতরেই একটা জঙ্গল। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমি আগে আগে, টাঙ্গাওলা আমার পেছনে। কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল মাটিতে ভেঙে পড়ে আছে একটা টিনের শেড। কাঠের খুঁটিগুলো রোদে, বৃষ্টিতে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। শুধু মর্চে-ধরা লোহার জালগুলো এখনও টিঁকে আছে কোনও-কোনও জায়গায়। কালীকিঙ্করের এভিয়ারির ধ্বংসাবশেষ।

"নিচু হয়ে জালের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরটা অন্ধকার। একটা ছুঁচো কিংবা মেঠো ইঁদুর কিঁচকিঁচ করে চিৎকার করে দৌড়ে গেল। একটা সড়সড় আওয়াজ হল কোথাও। আর তারপরেই টাঙ্গাওলা যে-জিনিসটায় হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল, অন্ধকারেও সেটাকে চিনতে আমাদের কারও একটুও অসুবিধে হল না।

"চারিদিকে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়েছে। চোরকাঁটার জঙ্গল চারিদিকে। ভাঙা কাঠের টুক্‌রো, লোহার ফ্রেম-এর অংশ, মর্চে-ধরা জাল। তার ভেতর থেকে, হঠাৎ দেখলে চোখে পড়ে না, বেরিয়ে আছে মানুষের একটা কঙ্কাল।

"টাঙ্গাওলা আমার জন্যে অপেক্ষা না করেই ঊর্ধ্বশ্বাসে বাগান পেরিয়ে গেটের বাইরে পৌঁছে টাঙ্গায় উঠে বসে তার ঘোড়াকে এক ছিপ্‌টি লাগিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সেই কুয়াশানামা রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

"এভিয়ারির ভগ্নাবশেষের বাইরে এসে আমার হঠাৎ মনে পড়ল কালীকিঙ্করের রিসার্চপেপার্সের কথা।

"বাড়িটার সামনে এসে দেখলাম, জানলা দরজার কপাট ভেঙে গেছে। ভেতরে অন্ধকার ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে।

"কোথাও কোনও শব্দ নেই। কোনও পাখির ডাকও না।

"বাড়িটার ভেতর ঢুকেই একটা গন্ধ পেলাম। যে-বাড়িতে বহুকাল কেউ থাকে না, সে-রকম বাড়ির ভেতর ঢুকলে যে রকম একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যায়। ঘরগুলো খাঁখাঁ করছে। আমার সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল বাড়িটার ভেতর কোথাও কোনও প্রাণীর সাড়াশব্দ না-পেয়ে। ইঁদুরের দৌড়ে যাওয়ার কিংবা চামচিকের ঝাঁক ঝটপট করে ওঠার শব্দ হল না কোনও ঘরে। ঘরগুলো কবরের মতো শূন্য, নিঃশব্দ।

"একতলার সবগুলো ঘর দেখা শেষ হলে অন্ধকারে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় পৌঁছলাম। সেই থমথমে নৈঃশব্দ্যের ভেতর কাঠের সিঁড়িতে আমার পায়ের আওয়াজ ভীষণ অদ্ভুত শোনাল।

"ঘরের ভেতর অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু দেওয়ালের তাকে হার্ডকাভার ফোল্ডারটা চিনতে অসুবিধে হল না।

"ফাইলটা হাতে নিয়ে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই হঠাৎ চোখে পড়ল, অনেকটা উঁচুতে একটা টানাপাখার ফ্রেমের ওপর নিঃশব্দে বসে নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড দাঁড়কাক।"

ছবি : অনুপ রায়

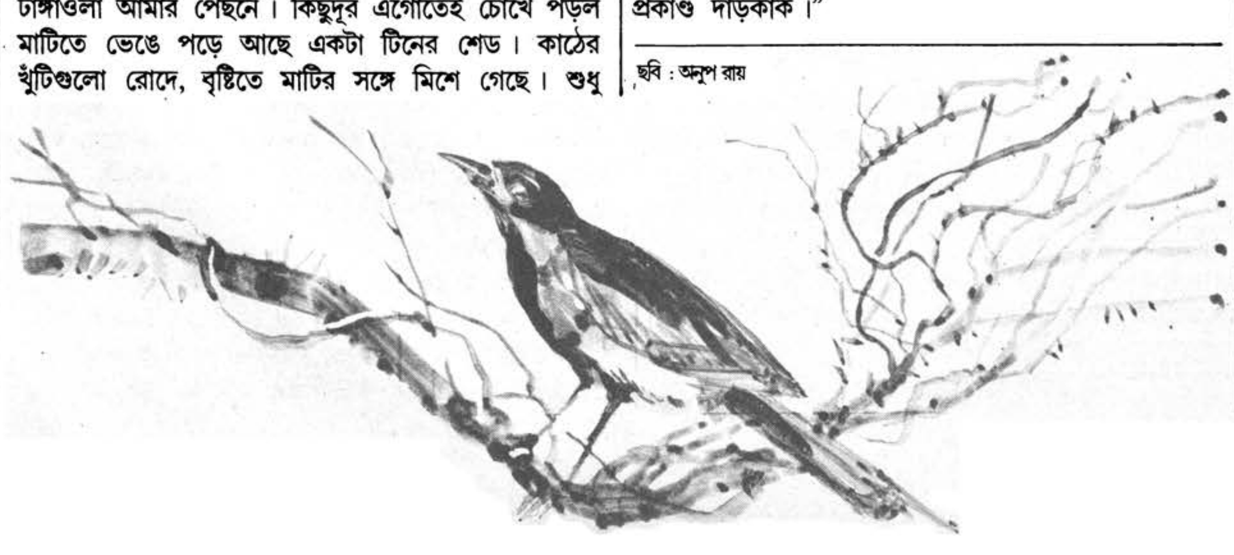

ডাক্তারবাবু বলছেন

বসন্তের খাওয়াদাওয়া

শীত কমে আসছে। আবহাওয়াও এখন বেশ ফুরফুরে। না গরম, না ঠাণ্ডা ভাব। ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। কিন্তু এই সময়ে অসুখবিসুখের ভয়ও কম নয়। বাতাসে 'হিমের পরশ' কমে গেলে বাতাস হালকা হয়ে যায়, আবার গরমের আর্দ্রতাও তখনও পুরোপুরিভাবে বাতাসে মেশে না, সেইজন্য বসন্তের বাতাস শুকনো, অথচ গরম নয়।

বসন্ত ঋতুতে বসন্ত রোগের ভাইরাস বাতাসে উড়ে বেড়ায়। আর আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভিতর ঢুকে রোগ তৈরি করে। এ ছাড়াও বাতাসে উড়ে বেড়ানো জীবাণু বা ভাইরাস থেকে যে-সব রোগ হয়, তার বেশির ভাগই বসন্তকালে হতে পারে।

সেইজন্য বসন্তকালে একটু সাবধানে থাকতে হয়। খাওয়াদাওয়ার ধরনও একটু বদলে ফেলতে হয়। এই সময়ে রোজ খাবার সময় তেতো খাবে। নিমপাতা ভাজা, অথবা নিম বেগুন দিয়ে খাওয়া শুরু করবে। নিম খুব ভাল অ্যান্টিসেপটিক। নিমপাতার জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে। রোজ যদি নিমপাতা, উচ্ছে কিংবা করলা—যে-কোনও একটার তরকারি খাও, তা হলে সহজে আর অসুখবিসুখ হবে না।

এই সময়ে বেশি করে সজনে-ডাঁটাও খাবে। সজনে-ডাঁটার যে তরকারিই হোক পুরোপুরি খেয়ো। চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। সজনে-ডাঁটা খাওয়ার দুটো উপকারিতা আছে। প্রথম হচ্ছে, তুমি যত চিবোবে, মুখের মধ্যে তত লালা নিঃসরণ হবে। লালারসের মধ্যে এক রকমের এনজাইম আছে, যার নাম টায়লিন। (বাংলায় 'ট' দিয়ে লিখলাম, কিন্তু ইংরেজি বানানে টি-এর আগে 'পি' আছে। পি সাইলেন্ট। উচ্চারণ হবে না, তাই নামটি হল টায়লিন।) ভাত আলু রুটি প্রভৃতি খাদ্যের মধ্যে শর্করা আছে। যার ইংরেজি নাম পলিস্যাকারাইডস। পলিস্যাকারাইডস ভেঙে ডাই স্যাকারাইড হয়, তারপর ডাই স্যাকারাইড ভেঙে মনো স্যাকারাইড হয়, এই মনো স্যাকারাইড হল গ্লুকোজ। পলিস্যাকারাইডসকে ভেঙে ডাই স্যাকারাইডস করে টায়লিন এনজাইম। তার মানে ভাত প্রথম হজম হতে আরম্ভ হয় মুখের মধ্যে, আর যত বেশি লালা মিশবে তত বেশি হজম হবে। সেইজন্য খাবার খুব ভাল করে চিবোনো দরকার। পরের কারণ হল সজনে-ডাঁটার রস জীবাণু মেরে ফেলে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যান্টিসেপটিক। সজনে-ডাঁটা এত ভাল যে,সজনে-ডাঁটার রস দিয়ে ওষুধ তৈরি হয়। সজনে-ডাঁটার রস যত বেশি খাবে,অন্ত্রের জীবাণুনাশক ক্ষমতাও তত বেড়ে যাবে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

জেনে নাও

বেশি জ্বরে জলপটি দেওয়া হয় কেন ?

কারও খুব বেশি জ্বর হলে ডাক্তারবাবু কপালে জলপটি দিতে বলেন। মা কপালে জলের পটি লাগান আর আস্তে আস্তে পাখার বাতাস করেন।

জলপটি লাগালে কী হয় ?

জ্বরের সময়ে শরীরে তাপ বেশি। পাখার বাতাসে জল যাচ্ছে উবে। জল থেকে বাষ্প—অবস্থার বদল—এই বদলের জন্যে যে তাপের দরকার তা জোগাচ্ছে শরীরের উত্তাপ। ফলে উষ্ণতা কমে আসার কথা।

ভিজে জামা-কাপড় শরীরে বেশিক্ষণ রাখলে ঠাণ্ডা লেগে যায় একই কারণে। শুকনো পরিবেশে আর হাওয়া দিলে জল দ্রুত বাষ্প হবে। আর বাষ্প হওয়ার জন্যে যে তাপ লাগবে, সে-তাপ জোগাবে শরীর। শরীরের তাপ বেরিয়ে গেলে ঠাণ্ডা তো লাগবেই।

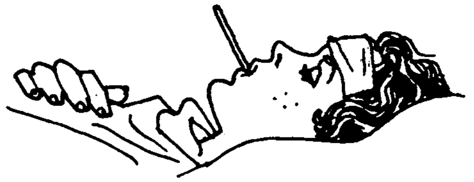

আমেরিকায় যখন দিন, আমাদের তখন রাত কেন ?

পৃথিবীর সব জায়গায় যদি একসঙ্গে দিনের আলো ফুটত বা একসঙ্গে রাতের অন্ধকার নামত তো বেশ হত। কিন্তু তা হয় না। দিন-রাত একসঙ্গে ছড়িয়ে আছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। এক জায়গায় যখন ভোর হচ্ছে, অন্য জায়গায় তখন সন্ধে নামছে বা এক জায়গায় যখন বেলা দুপুর, অন্য জায়গায় তখন মাঝ-রাত্তির। একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অবস্থা। আর আমাদের দেশে যখন দিন, আমেরিকায় তখন রাত।

কেন ?

আমরা সবাই জানি পৃথিবীটা গোল।

এই গোল পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক দিয়ে চব্বিশ ঘন্টায় একটা পাক দেয় সূর্যকে সামনে রেখে।

পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক দিয়ে ঘোরার সময়ে যখন পৃথিবীর যে অংশটা সূর্যের সামনে আসতে থাকে, তখন সেই অংশে শুরু হয় দিন। আর যে অংশ সূর্যের আলো থেকে সরে যেতে থাকে, সেই অংশে রাত। তা হলে পৃথিবীর পিঠোপিঠি দুটো জায়গার একটাতে দিন হলে আর একটাতে রাত হবে।

আমাদের দেশের ওপরে যখন সূর্যের আলো পড়ে, তখন আমাদের দেশে দিন। আমাদের দেশের ঠিক উলটোদিকে আছে আমেরিকা। তা হলে আমেরিকাতে রাত। আর আমেরিকাতে যখন সূর্যের আলো গিয়ে পড়ে তখন সেখানে দিন আর আমাদের দেশে রাত।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

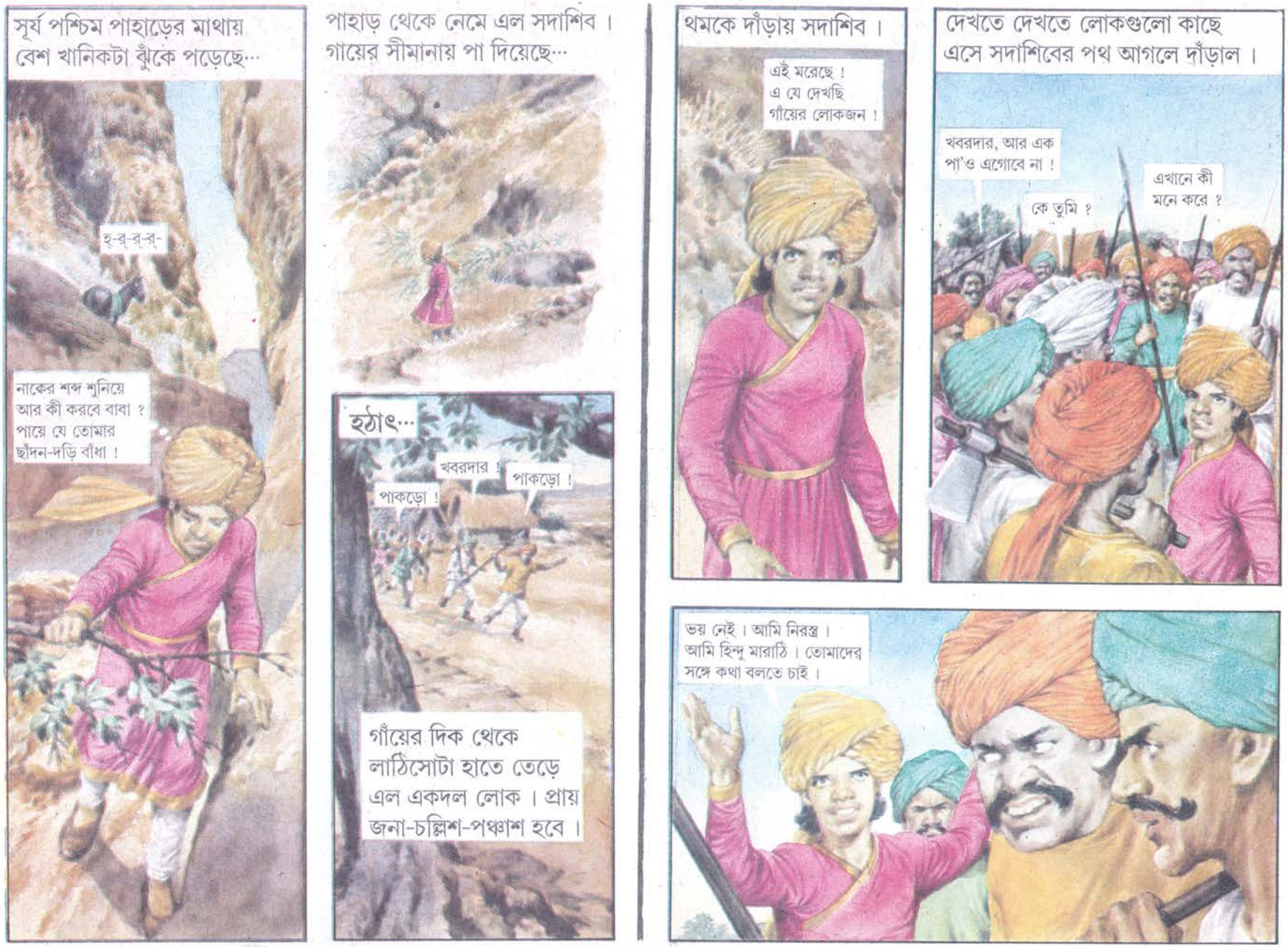
সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের মাথায় বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে…
হ-র্-র্-র্-
নাকের শব্দ শুনিয়ে আর কী করবে বাবা ? পায়ে যে তোমার ছাঁদন-দড়ি বাঁধা !
পাহাড় থেকে নেমে এল সদাশিব । গায়ের সীমানায় পা দিয়েছে…
হঠাৎ…
খবরদার !
পাকড়ো !
পাকড়ো !
গাঁয়ের দিক থেকে লাঠিসোটা হাতে তেড়ে এল একদল লোক । প্রায় জনা-চল্লিশ-পঞ্চাশ হবে ।
থমকে দাঁড়ায় সদাশিব ।
এই মরেছে ! এ যে দেখছি গাঁয়ের লোকজন !
দেখতে দেখতে লোকগুলো কাছে এসে সদাশিবের পথ আগলে দাঁড়াল ।
খবরদার, আর এক পা'ও এগোবে না !
কে তুমি ?
এখানে কী মনে করে ?
ভয় নেই । আমি নিরস্ত্র । আমি হিন্দু মারাঠি । তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই ।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

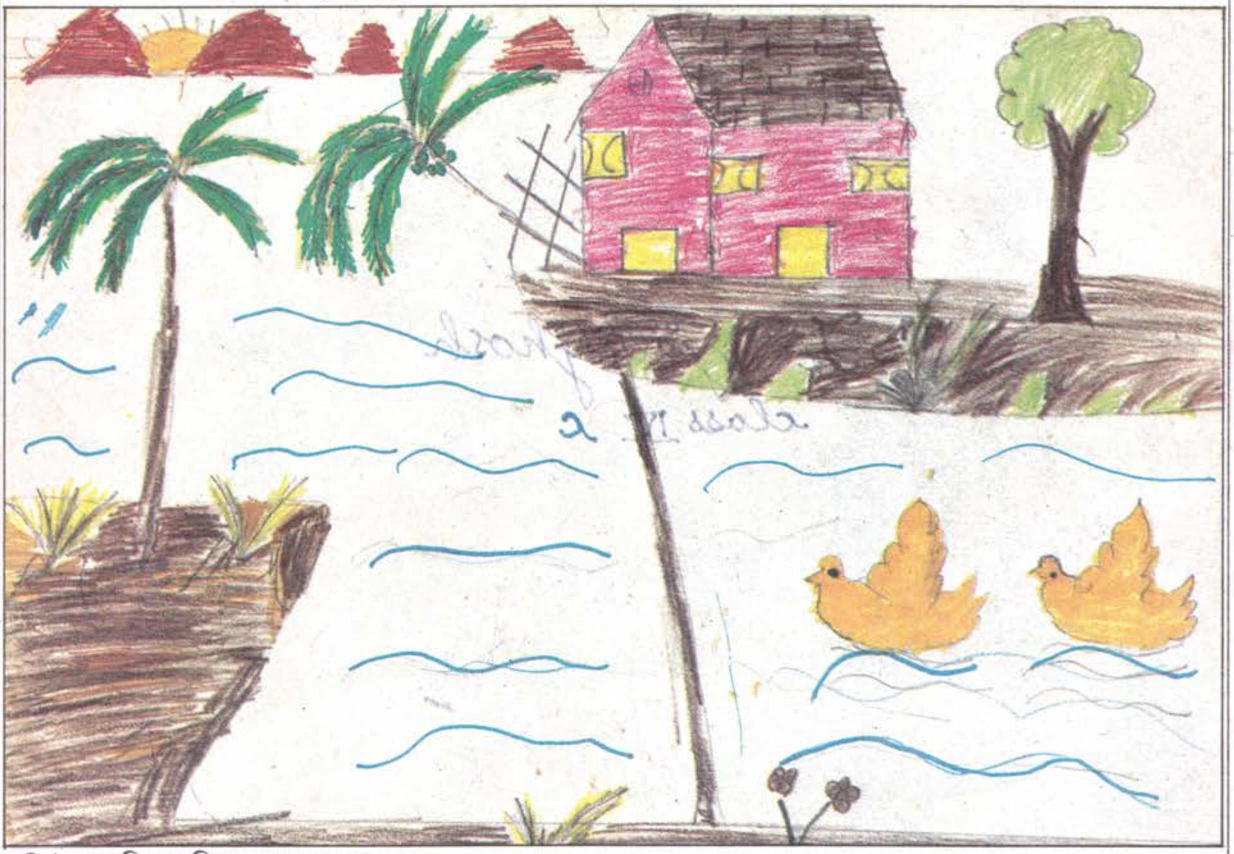

ছবি এঁকেছে **তিলাঞ্জলি ঘোষ** (বয়স ৯)

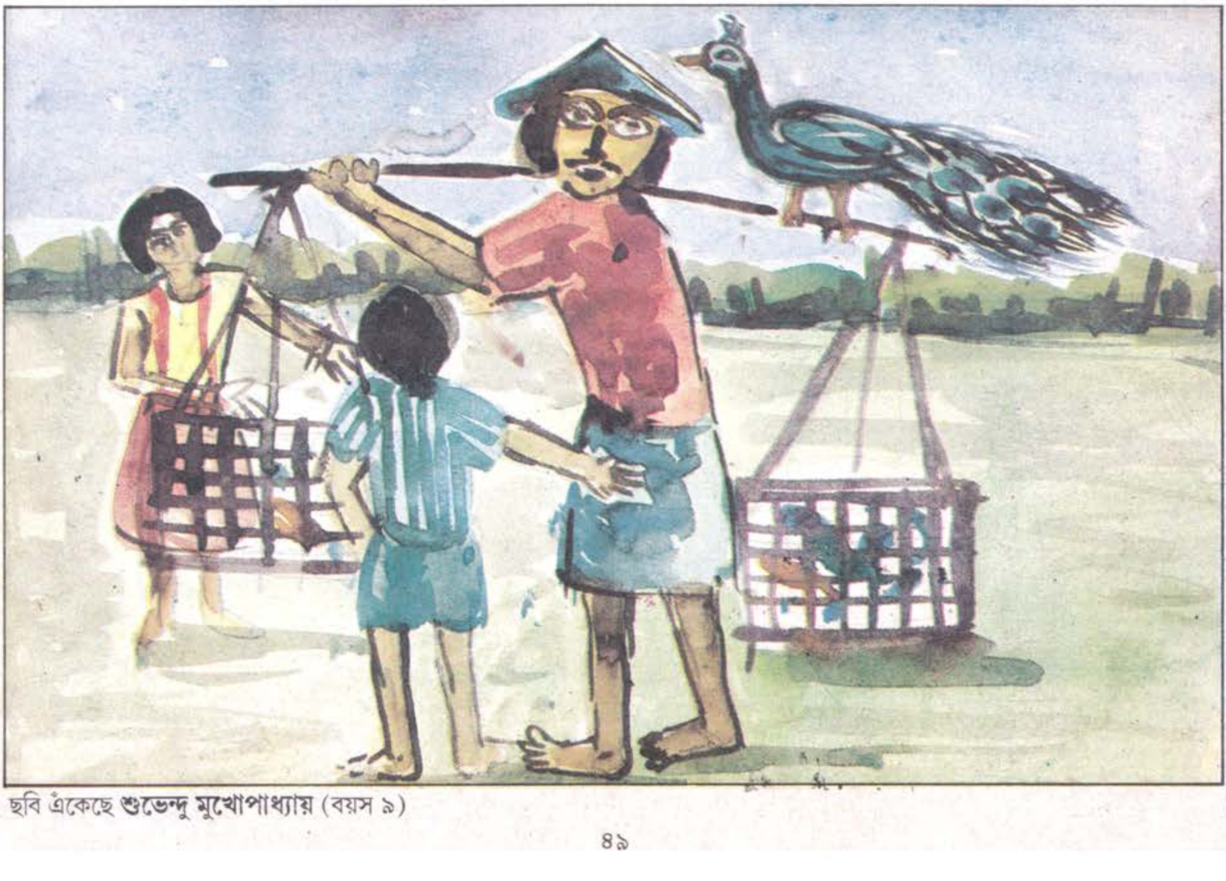

ছবি এঁকেছে **শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়** (বয়স ৯)

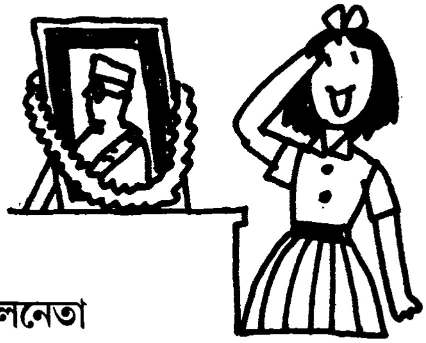

স্বপ্নের দলনেতা

স্কুল থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে খেলতে গেলাম, খেলে এসে একটু বিশ্রাম করে একটা বই নিয়ে ঢুকলাম লেপের তলায়। জানুয়ারি মাস। স্কুলে পড়ার চাপ নেই বললেই চলে।

'স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ছেলেবেলা' নামের বইটি পড়তে খুব ভাল লাগছিল। কিন্তু কিছুটা পড়ার পরে ঘুম পেয়ে গেল ভীষণ। ভাবলাম, ঘুমিয়েই পড়ি, কাল বাকিটুকু শেষ করা যাবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

একজন সাহেব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অন্যমনস্ক ভাবে। পিছন থেকে একজন ভারতীয় এসে তাকে গুলি করে পালাল। গুলি খেয়ে সাহেব সেখানেই পড়ে গেল। লোকটি নিজের দলে ফিরে গিয়ে সে-কথা জানাল।

তারপর দেখি রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে চলেছে বিরাট এক দল। সামনে দলনেতা, বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাঁর চোখেমুখে তেজ ও অসীম সাহসের ছাপ।

সহসা কার ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। মা বললেন, "ইংরেজ হঠাও, ইংরেজ হঠাও করে চেঁচাচ্ছিলি কেন পাগলের মতো ? স্কুলে যাবি না।"

দেখলাম বেলা হয়ে গেছে। বাইরে রোদের ঝিলিক। মা আবার বললেন, "আজ তেইশে জানুয়ারি, সকালে স্কুল তো !"

চটপট ইউনিফর্ম পরে স্কুলে গেলাম। গিয়ে দেখি সুভাষচন্দ্র বসুর ফোটো সাজানো হয়েছে। কত ফুল, মালা ! জাতীয় পতাকা উড়ছে মাঝ-মাঠে। আমার স্বপ্নের সেই কুচকাওয়াজের মতোই প্যারেড হচ্ছে মাঠে।

নেতাজির ফোটো দেখেই মনে পড়ে গেল—আরে ! স্বপ্নেই তো এই দলনেতাকে দেখেছি !

পার্বতী ঘোষ (বয়স ১২)

নিউ মার্কেটের জন্যে দুঃখ

আমরা মাঝে-মাঝে কলকাতা যাই। এবারেও পরীক্ষা শেষ হতেই গিয়েছিলাম।

কলকাতা গেলেই আমার মা একদিন নিউ মার্কেটে যাবেনই। এবারে আমিও মা'র সঙ্গে গিয়েছিলাম। ঘুরে-ঘুরে মা বাজার করলেন। কিছু গ্রিটিংস কার্ড আর খেলনা কেনা হল।

যে দোকান থেকে সব সময় আমাদের জামা-প্যান্ট কেনা হয় সেই দোকানেও গিয়েছিলাম। বড়দিন উপলক্ষে কী চমৎকারভাবে নিউ মার্কেট সাজানো হয়েছে।

ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। তারপর কিছু খাওয়াদাওয়া করে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন সকালে বাবা একটা কাজে ধর্মতলায় গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই মাকে বললেন, "তোমরা নিউ মার্কেট যেতে এত ভালবাস, কাল রাত্রে সেই মার্কেট পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

খবরটা শুনে আমাদের সবার খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সুবর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে **বার্তিক চক্রবর্তী** (বয়স ৭)

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে চা-বাগানে এসেছিল। বেওয়ারিশ ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে সুধাময় সেন তাকে বিছের কামড় থেকে বাঁচান। তিনি নাকি নেতাজির ফৌজে ছিলেন, ইংরেজদের হাতে বন্দী হন, পালিয়ে জঙ্গলে আছেন, বাইরের জগতের খবর রাখেন না। সায়নকে তিনি যে জংলি মানুষদের ডেরায় নিয়ে যান, তাদের পোশাকে সেই অগ্নি-চিহ্ন, যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো ভয় পেয়েছিল। অন্যদের চোখ এড়িয়ে গুহায় ঢুকে সায়ন আক্রান্ত হয়। গুহাটা কি স্মাগলারদের ? উদ্ধার পেয়ে সে দ্যাখে, দু'জন বন্দী লোকের একজনকে মেরে ফেলা হল। গুপ্ত মালের হদিস দেবার জন্য অন্যজনকে এক অশ্বারোহী নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে দুজনেই মারা পড়ে। সায়ন বোঝে, এরা স্মাগলার, এবং সুধাময় এদের নেতা। মৃত অশ্বারোহীর ঘোড়ায় উঠে সে পালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। তাকে যখন মারবার কথা হচ্ছে, তখন কালো ঘোড়ায় চেপে কেউ একজন এসে একটা খবর দেয়। সায়নকে নিয়ে দ্রুত স্থানত্যাগ করেন সুধাময় ও তাঁর জংলি সঙ্গীরা। তারপর···

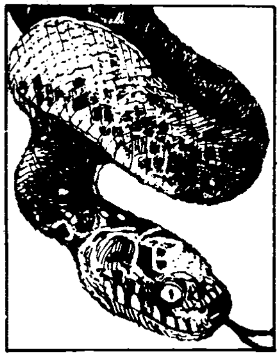

বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর প্রচণ্ড শব্দটা কানে এল। খুব উঁচু থেকে জল পড়লে এমন শব্দ হয়। এইসব পথঘাট ন্যাড়া-মাথার চমৎকার জানা, সুধাময়েরও, ওদের ভঙ্গি দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। শব্দটা খুব কাছাকাছি হয়ে গেলে ওরা স্বচ্ছন্দে বাঁ দিকে বাঁক নিল। সায়ন দেখল, এখানে ঝরনার চেহারাটা সরু হয়ে এসেছে। ফলে জল বেড়েছে, স্রোত কমেছে। কিন্তু সেই জমে-ওঠা জল আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচে। শব্দটা সেই কারণেই। নায়েগ্রা ফল্‌সের ছবি দেখেছিল সে। তারই একটা ছোট্ট সংস্করণ যেন এটা। ঘোড়াটা যখন বাঁক নিচ্ছে, তখন এক পলকের জন্যে সে দেখতে পেল নীচে পড়ে ঝরনাটা যেন আরও ছড়িয়ে নদী হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এই নদীটাই তাদের চা-বাগানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সায়ন একবার ন্যাড়া-মাথার লাগাম-ধরা হাতের দিকে তাকাল। কিছুই করার নেই। এদের সঙ্গে সে কোনওমতেই পেরে উঠবে না। সুধাময় সেন তাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবেন।

ঠিক সেই সময় মাথার ওপরে একটা যান্ত্রিক শব্দ বাজল। দূর থেকে ছুটে আসছে শব্দটা। সুধাময় সেন চিৎকার করে কিছু বলতেই, ন্যাড়া-মাথা লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে সায়নকে নামিয়ে ঘোড়া নিয়ে ছুটল জঙ্গলের আড়ালে। সুধাময় তখন একটা পাথরের ওপর উঠে আকাশটাকে লক্ষ করে বিড়বিড় করছেন, "হেলিকপ্টার ! হেলিকপ্টার কেন এল এদিকে ?" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সায়নকে দেখে বললেন, "চলে এসো এখানে, এই পাথরটার আড়ালে চলে এসো।"

শব্দটা তখন ঝরনার আওয়াজকে ছাপাতে যাচ্ছে। সায়ন আদেশ পালন করল। সুধাময় তাকে এক হাতে টেনে নিয়ে গেলেন পাথরের আড়ালে। আর তখনই মাথার ওপরে গোঁ-গোঁ শব্দটা চলে এল। মুখ তুলে সামান্য ঝুঁকতেই সায়ন হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পেল। এবং তখনই সে বুঝতে পারল, কোথাও যাওয়ার জন্যে ওটা আসেনি। ওরা কিছু খুঁজছে, কারণ, বেশ কয়েকবার একই জায়গায় পাক খেতে-খেতে এগোচ্ছে। একবার যেন একটা লোককে স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এবং তখনই সুধাময় সেনের হাতের বাঁধন শক্ত হল। ঠিক তখনই ঘোড়ার চিৎকার কানে এল। ভয় পেয়ে দুটো পা শূন্যে ছুঁড়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জন্তুটা। ন্যাড়া-মাথা সেটাকে সমস্ত শক্তি দিয়েও স্থির রাখতে পারল না। ঘোড়াটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসছে দেখে হেলিকপ্টারের কথা ভুলে গিয়ে সে ছুটল ঘোড়ার পিছু। দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করলেন সুধাময়। সম্ভবত সেটা গালাগালি। কারণ, ক্রোধে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। এই নিষেধটা সম্ভবত ন্যাড়া-মাথার কানে গেল না। সে তখনও চেষ্টা করে যাচ্ছে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে শান্ত করতে। এই সময় হেলিকপ্টারটা নীচে নেমে এল। সায়ন দেখল, ন্যাড়া-মাথা মুখ তুলে অবাক হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। সুধাময় সেন এবার বাংলায় বললেন, "গর্দভটা সব ডোবাল। দেখতে পেয়ে গেল ওর জন্যে। পাজিটাকে শেষ করতে হবে।"

আরও কয়েকবার পাক খেয়ে হেলিকপ্টারটা আকাশ কাঁপিয়ে ফিরে গেল যেখান থেকে এসেছিল। সুধাময় সেন আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর সেই দুর্বোধ ভাষায় চিৎকার করে উঠতেই লোকটার মুখ থেকে হাসি নিভে গেল। অত শক্তিশালী শরীর থাকা সত্ত্বেও লোকটা যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তারপর দু'হাত নেড়ে বোঝাতে চাইল বিড়বিড় করে নিজের ভাষায়। শব্দগুলো না বুঝলেও, অর্থ বোধগম্য হল। ঘোড়াটার জন্যেই লোকটা আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। অতএব দোষ যদি কেউ করে থাকে, তা হলে সে নয়, এই ঘোড়াটাই। তারপর মাথার উপর ওই যন্ত্রটা দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ, ওইরকম যন্ত্রকে সে কখনও আকাশে উড়তে দ্যাখেনি। এইটে বুঝতে সময় লাগল। সুধাময় সেন নিজেই বাংলায় চিৎকার করলেন, "প্লেন আর হেলিকপ্টারের পার্থক্য বোঝাতে হবে এখন আমাকে ?" লোকটা সত্যি অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। ঘোড়াটা এখন বেশ শান্ত, চুপটি করে তাকিয়ে আছে।

সুধাময় সেন সায়নের দিকে তাকালেন, "আর আমার হাতে বেশি সময় নেই। মনে হচ্ছে ওরা কিছু আন্দাজ করেছে। এই পাহাড়ে কখনওই এইভাবে হেলিকপ্টারের সাহায্যে খোঁজাখুঁজি চলেনি। হয়তো ওরা তোমার সন্ধানে এসেছিল, নয়তো সাপ্লায়াররা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর ওই হাঁদারামটা জানিয়ে দিল, ঘোড়া নিয়ে এই অঞ্চলে কিছু মানুষ লুকিয়ে থাকে ! আমাকে এখনই চলে যেতে হবে আরও ভিতরে। তোমাদের দু'জনকে তো আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না !"

এমন সাদা, যেন নতুন!

ধোলাইয়ের পর ধোলাই...প্রতি ধোলাই !
পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ -এর ধোলাই এমন সাদা, যেন নতুন !

প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তাজা. তেমনিই ধবধবে সাদা……যেন সদ্য কেনা প্যাকেট থেকে বার করা।

কারণ, পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো……অনেক শক্তিশালী, অনেক রক্ষাকারী। এতে রয়েছে এমন শক্তি যা কাপড়ের গভীরে পৌঁছে সাফ করে. আর এখন এতে ফেনাও রয়েছে অনেক বেশী।

সার্ফ কাপড়ের বেয়াড়া ময়লাও তুলে বার করে দেয় – তাই শুভ্রতাও হয় দীর্ঘস্থায়ী—আর, সার্ফ কাপড় রাখে সুরক্ষিত……সবসময় নতুনের মত। সাদা, রঙীন, বিশিষ্ট বা আটপৌরে—সবকিছুকেই সার্ফ করে রাখে—সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সাদা……নতুনের মত সদাসর্বদা !

ধোলাইয়ের তো হাজার পাউডার আছে, কিন্তু পরিবারের সবার জামাকাপড়ের জন্যে আপনার ভরসাযোগ্য হ'ল – একমাত্র সার্ফ !

POWER
PACKED
Surf
washes whitest...
keeps clothes like new!
সার্ফ

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা,কাপড় নতুন দেখায় সদা!

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS SU 331 2719 BG

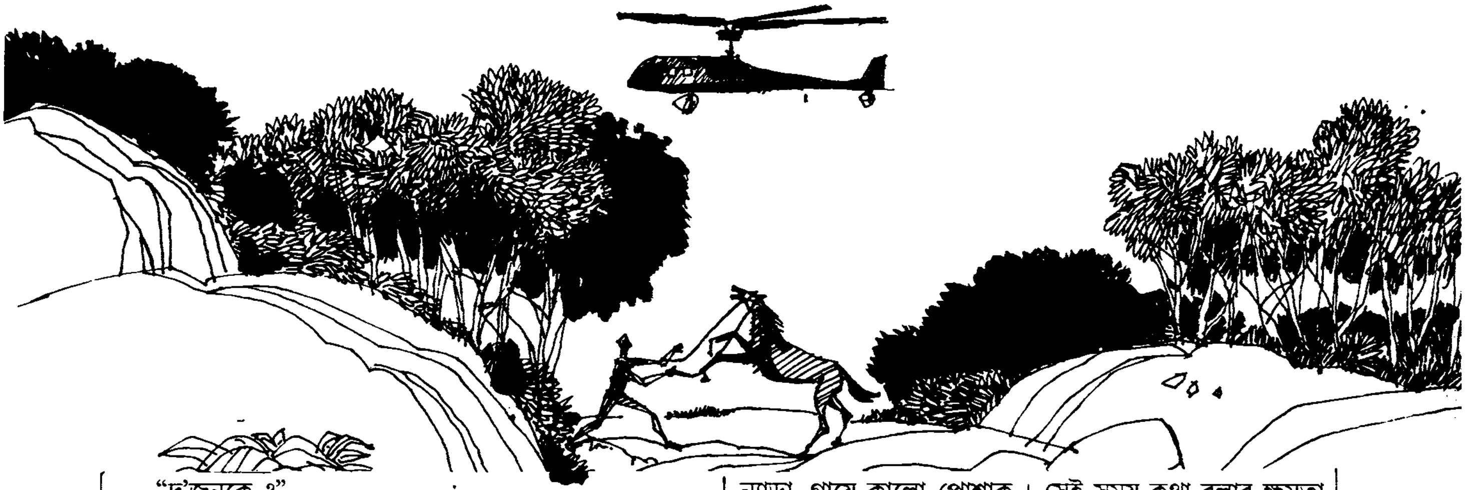

"দু'জনকে ?"

"নিশ্চয়ই। ওই লোকটা শৃঙ্খলা মানেনি। আমার হুকুম ছিল, আকাশে কিছু এলেই সবাই জঙ্গলের আড়ালে চলে যাবে। ও সেই হুকুম মানেনি। তোমাকে যে শাস্তি দেব, ওর ভাগ্যে সেটাই জুটবে। এবার চটপট কথা শেষ করে নিই।" সুধাময় সেন এই অবধি বলে আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর একটা পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসে সামান্য সময় চোখ বন্ধ করে বললেন, "আমার সঠিক বয়স কত মনে হয় তোমার ?"

"সঠিক ?"

"বাঙালি ছেলে বাংলা শব্দ বোঝো না? সঠিক মানে একদম ঠিক।"

"আমি বলতে পারব না।"

"হুঁ! আমিও বলতে চাই না। তবে যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে মেদিনীপুরে খুব আন্দোলন চলছে। ব্রিটিশদের বলা হচ্ছে ভারত ছাড়তে। আমি তখন তরুণ। বাড়িতে খুব অভাব। মা মারা গিয়েছিলেন ছেলেবেলায়। বাবাও গেলেন। কাকারা দু'বেলা গালমন্দ করত। শেষ পর্যন্ত বাঁচার তাগিদে পল্টনে নাম লেখালাম। স্বাস্থ্য ভাল ছিল আর পিছুটান ছিল না। তরতর করে উঠে যাচ্ছিলাম। সেই সময় বর্মায় ব্রিটিশরা আমাদের ছেড়ে পালাল। সুভাষচন্দ্র ডাক দিলেন। আর আমরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিলাম। হ্যাঁ, আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলাম। আমরা যখন সুভাষচন্দ্রের ডাকে দিল্লি দখল করার জন্যে ইম্ফলের দিকে এগোচ্ছি, তখন ব্রিটিশদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধে আমাদের দলটা ছড়িয়ে গেল। আমি পথ হারালাম, দলটাকে খুঁজে পেলাম। তোমাকে একদিন এসব কথা বলেছি। পালিয়ে চলে এলাম এখানে। তখনও আমার ধারণা ছিল ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যায়নি। পাহাড়ের গুহায় একদম বনমানুষের মতো লুকিয়ে বাস করতাম। সেই সময় একদিন ওই নদীর ধারে মানুষের চিৎকার শুনতে পেলাম। চিৎকারটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল। আমি জানতাম, এই বিশাল জঙ্গলে, পাহাড়ে আমি ছাড়া আর কোনও মানুষ বাস করে না। তখন আমি দীর্ঘকাল একা, মানুষের মুখ দেখিনি। তাই চিৎকার শুনে আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে গেলাম গোপন আস্তানা ছেড়ে। গিয়ে দেখলাম একটি বয়স্ক ন্যাড়া-মাথা মানুষ আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। শকুন, হায়না আর শেয়ালরা চলে এসেছে কাছাকাছি। মানুষটার মাথা ন্যাড়া, গায়ে কালো পোশাক। সেই সময় কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তার। আমি তাকে তুলে নিয়ে এলাম গুহায়। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে কিছু বনজ ওষুধের ব্যবহার শিখেছিলাম। তা ছাড়া আমার ব্যাগে কিছু ওষুধ তখনও অবশিষ্ট ছিল। ভাগ্যই বলতে হবে, মানুষটি সেরে উঠল। আমি তার ভাষা বুঝি না সেও আমার ভাষা বোঝে না। কিন্তু সেরে উঠলেও তার ডান পা চিরকালের মতো খোঁড়া থেকে গেল। প্রায় তিন সপ্তাহ একসঙ্গে থাকার পর আমি তার ভাষা অতি সামান্য হলেও কাজ চালাবার মতো বুঝে নিলাম। এই সময় মানুষটি আমাকে জানাল, পরের পূর্ণিমার আগেই তাকে দলে ফিরতে হবে। কারণ, তার দলের নিয়ম হল, নেতা যদি মারা যায় বা হারিয়ে যায়, তা হলে পরবর্তী নেতার নির্বাচন পূর্ণিমা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। একবার নতুন নেতা নির্বাচিত হয়ে গেলে পুরনো নেতা ফিরে এলেও তাকে সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। পূর্ণিমার বেশি দেরি নেই। আমি মানুষটিকে তারই ঘোড়ায় চাপিয়ে নির্দেশ মতো চলতে লাগলাম।"

এই সময় আবার মাথার ওপর গোঁ-গোঁ শব্দ উঠল। দ্রুত নেমে এলেন সুধাময়। তারপর ইশারা করলেন ন্যাড়া-মাথাকে, চটপট আড়ালে যেতে। এবার ন্যাড়া-মাথা ঘোড়াটাকে নিয়ে ছুটে গেল গাছের আড়ালে। পাথরের ধার ঘেঁষে বসে সায়ন আবার হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পেল। ওটা ফিরে এসে এখানেই পাক খাচ্ছে। ওরা লোকটাকে দেখেছিল এখানেই। এখন যদি বেরিয়ে হাত নাড়ে সে ? অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল সায়ন। এই ঘন জঙ্গলে কখনওই হেলিকপ্টার নামতে পারবে না। সুধাময় তার আগেই তাকে শেষ করে ফেলবেন। এত তাড়াতাড়ি মরে যেতে চায় না সে। কোথায় যেন পড়েছিল, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তা ছাড়া সুধাময় সেনের গল্প শুনতে তার খারাপ লাগছে না। হেলিকপ্টারের আওয়াজ কানে নিয়েই সে জিজ্ঞেস করল, "তারপর ?"

সুধাময় অবাক হয়ে গেলেন। চাপা গলায় বললেন, "তোমার ভয় করছে না ?"

"কিসের ভয় ?"

"গল্প শুনতে চাইছ, কিন্তু এই গল্প তো কাউকে শোনাতে পারবে না। ওরা টের পেয়ে গেছে। এগুলো সব মিলিটারির হেলিকপ্টার। তোমাকে মেরে আমায় চলে যেতে হবে এক্ষুনি।" (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : অনুপ রায়

সিলভার ব্লেজ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : রেসের ঘোড়া 'সিলভার ব্লেজ' আস্তাবল থেকে উধাও। ঘোড়াটির দেখাশোনা করবার ভার ছিল মিঃ স্ট্রেকারের উপরে, আর আস্তাবল পাহারা দেবার ভার ছিল যাদের উপরে, তাদেরই একজনকে, তার নাম হাণ্টার, খাবার পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল এডিথ। পথে যে-লোকের সঙ্গে এডিথের দেখা হয়, আস্তাবলে পৌঁছে সে বলে, সিলভার ব্লেজ হেরে যেতে পারে। তাই শুনে হাণ্টার তাকে তাড়া করে যায়। মিঃ স্ট্রেকার মধ্যরাতে আস্তাবলে এসেছিলেন। পরদিন এক ঝোপে আবিষ্কৃত হয় তাঁর মৃতদেহ। ডান হাতে রক্তমাখা ছুরি। বাঁ হাতে রেশমি টাইয়ের টুকরো। টাই সেই রহস্যময় লোকটির। পুলিশের বিশ্বাস, সে-ই খুনি। লোকটির নাম সিমসন। ব্লেজ হারলে তার লাভ আছে। তারপর···

হোমস গাড়ির গদিতে আরাম করে ঠেস দিয়ে বসল। আর কোনও কথা হল না। একটু পরেই আমাদের গাড়িটা একটা লাল রঙের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটা রাস্তার ওপরেই। বাড়িটার থেকে সামান্য একটু দূরে একটা ছোট ঘোড়া ছোটাবার মাঠ। আর মাঠের পরে একটা ছাই রঙের টালির বাড়ি। এ ছাড়া যেদিকে তাকানো যায় মাঠ আর মাঠ। শুকনো ফার্নের জন্যে মাঠের রঙ কেমন অদ্ভুত তামাটে দেখাচ্ছে। বহু দূরে ট্যাভিস্টকের চার্চের আর বড়-বড় বাড়ির চুড়োগুলো দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়ে। ওটা কেপলটন আস্তাবল।

আমরা সকলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। হোমস নামল না। সে গাড়ির গদিতে হেলান দিয়ে বসে রইল। লক্ষ করলুম, সে অপলকভাবে সামনের মাঠ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলুম যে, গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে বলেই তার আর কোনও দিকে খেয়াল নেই। খানিক পরে আমি তার কাঁধটা নাড়িয়ে দিতেই তার চটকা ভেঙে গেল। হোমস তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এল।

কর্নেল রস তার হাবভাব দেখে অবাক হয়ে গেছেন বুঝতে পেরে হোমস বলল, "এক্সকিউজ মি, কর্নেল। আমার বোধহয় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।"

হোমসের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলুম, হোমসের চোখদুটো খুব চকচক করছে। আর তার মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনার ভাব। হোমসের চলন-বলন সবই আমার জানা। বুঝলুম সে কোনও একটা দরকারি সূত্র পেয়েছে। তবে সূত্রটা যে কী, তা আমি কিছুতেই ধরতে পারলুম না।

গ্রেগরি বললেন, "মিঃ হোমস, আগে খুনের জায়গাটা দেখতে যাবেন নিশ্চয়ই।"

"না। আগে এইখানে কয়েকটা ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে নিতে চাই। স্ট্রেকারের মৃতদেহ এখানে আনা হয়েছিল কি ?"

"হ্যাঁ। ভাল কথা, করোনার কোর্ট হচ্ছে আগামীকাল।"

হোমস কর্নেল রসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কর্নেল, জন স্ট্রেকার আপনার কাছে অনেক দিন কাজ করছে তো ?"

"হ্যাঁ। লোকটা খুব খাঁটি আর কাজের ছিল।"

"ইন্সপেক্টর, স্ট্রেকারের পকেটে যেসব জিনিস পাওয়া গিয়েছিল তার একটা ফর্দ আছে কি ?"

"হ্যাঁ। তা ছাড়া জিনিসগুলো বসবার ঘরে রাখা আছে। দেখবেন নাকি ?"

"একবার দেখব।"

আমরা দল বেঁধে বসবার ঘরের দিকে গেলুম। ঘরের মাঝখানে একটা বেশ বড় আকারের টেবিল। আমরা সেই টেবিলটার চারপাশে বসলুম। গ্রেগরি একটা চৌকো বাক্সের তালা খুলে তার ভেতর থেকে একগাদা জিনিস বের করল। একবাক্স দেশলাই, একটা দু'ইঞ্চি মতো লম্বা মোমবাতির টুকরো, একটা ব্রায়ার পাইপ, একটা সিলমাছের চামড়ার তামাক রাখবার থলি, থলিতে আধ আউন্স মতো কাভেণ্ডিস তামাক, একটা সোনার চেন লাগানো রুপোর ঘড়ি, একটা অ্যালুমিনিয়ামের পেন্সিল রাখার বাক্স, কয়েকটা কাগজ, কিছু খুচরো পয়সা, একটা হাতির দাঁতের বাঁটওলা ছোট ছুরি। ছুরিটা মোড়া যায় না। ছুরির ফলাটা খুব সরু। ফলাটার ওপরে ভাইস অ্যান্ড কোং, লন্ডন ছাপ মারা।

ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে হোমস বলল, "অদ্ভুত ছুরি। রক্তের দাগ লেগে আছে দেখছি। এই ছুরিটাই তা হলে স্ট্রেকারের হাতে ছিল। ···ওয়াটসন, এ-ছুরিটা বোধহয় তোমাদের লাইনের জিনিস।"

"হ্যাঁ, একে বলে ক্যাটারাক্ট নাইফ্," আমি বললুম।

"আমি সেই রকমই অনুমান করেছিলুম। এই ছুরির ফলাটা যেরকম খুব সরু আর পাতলা তাতে মনে হয় যে, খুব সূক্ষ্ম কাটাকাটির কাজে এই ধরনের ছুরি ব্যবহার করা হয়। ছুরিটা আবার মুড়ে রাখা যায় না। ঝড়-জলের রাতে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে এটাকে সঙ্গে রাখা একটু অদ্ভুত নয় কি ?"

গ্রেগরি বললেন, "ছুরির মুখটা একটা শোলার টুকরো দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল। সেটা আমরা মৃতদেহের কাছেই পেয়েছি। মিসেস স্ট্রেকার বলেছেন যে, ওটা কয়েক দিন ধরেই ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে ছিল। মিঃ স্ট্রেকার সেই রাতে বেরিয়ে যাবার সময় ওটা পকেটে পুরে নেন। আমার মনে হয়, হাতের কাছে আর কোনও কিছু না পেয়েই উনি ওটা নিয়ে নেন।"

"খুব সম্ভব আপনার ধারণাই ঠিক। ওই কাগজগুলো কী ?"

"কাগজগুলোর মধ্যে তিনটে হচ্ছে যারা ঘোড়ার খাবার পাঠাত তাদের হিসেব, একটা কর্নেল রসের চিঠি আর একটা বণ্ড স্ট্রিটের মাদাম লেসুরিয়রের পোশাকের দোকানের সাঁইত্রিশ পাউণ্ড পনেরো শিলিংয়ের বিল। বিলটা অবশ্য স্ট্রেকারের নামে নয়। তাঁর বন্ধু উইলিয়ম ডার্বিশায়ারের। ডার্বিশায়ারের নামে চিঠিপত্র বিল প্রায়ই স্ট্রেকারের ঠিকানায় আসত।"

বিলটা পড়তে-পড়তে হোমস বলল, "মিসেস ডার্বিশায়ারের

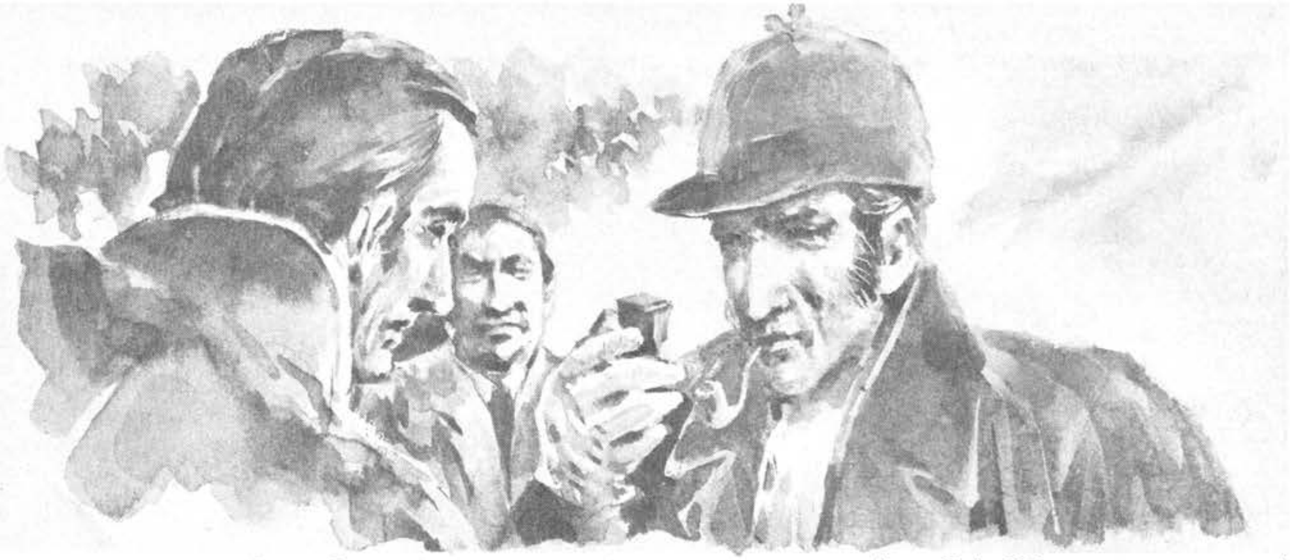

চাল-চলনে বড়মানুষি দেখছি। একটা জামার দাম বাইশ গিনি ! যাক, এখানে আর কিছু দেখবার নেই। চলুন, অকুস্থলে যাওয়া যাক।”

আমরা যখন বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে আসছি, তখন একজন ভদ্রমহিলা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ইন্সপেক্টরের হাতটা চেপে ধরলেন। তিনি কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন, “আপনারা কি সেই লোকটাকে ধরতে পেরেছেন ? তার খোঁজ পেয়েছেন ?”

“না, মিসেস স্ট্রেকার। তবে লণ্ডন থেকে মিঃ হোমস এসেছেন। এ ব্যাপারে তিনি আমাদের সাহায্য করছেন। আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।”

হোমস বলল, “আমার মনে হচ্ছে প্লিমথে একটা গার্ডেন পার্টিতে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মিসেস স্ট্রেকার।”

“না, আপনি ভুল করছেন।”

“কী আশ্চর্য। আমি হলফ করে বলতে পারি। আপনি একটা সুন্দর পাঁশুটে রঙের সিলকের পোশাক পরেছিলেন। সেই পোশাকে উট-পাখির পালক দিয়ে ভারী সুন্দর কাজ করা ছিল।”

“না, স্যার, আমার ও রকম কোনও পোশাকই নেই।”

“ও। তা হলে তো চুকেই গেল।” এর পর মিসেস স্ট্রেকারের কাছে তার ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে হোমস ইন্সপেক্টরের পিছন-পিছন বেরিয়ে এল। মাঠ দিয়ে সামান্য একটু হাঁটতেই, যে ডোবাটায় জন স্ট্রেকারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল আমরা সেখানে পৌঁছে গেলুম। ডোবার ধারে ফার্জের ঝোপ। ওই ঝোপেই স্ট্রেকারের ওভারকোটটা পাওয়া গিয়েছিল।”

হোমস জিজ্ঞেস করল, “সে-রাতে জোরে বাতাস বইছিল না নিশ্চয়ই ?’

“না, তবে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছিল।”

“তা হলে বাতাসে ওভারকোটটাকে উড়িয়ে আনেনি। ওটা ওখানেই রাখা হয়েছিল।”

“হ্যাঁ, কোটটা ঝোপের ওপর বিছিয়ে রাখা ছিল।”

“আপনার কথা শুনে আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এখানে অনেক লোক সোমবারের পর এসেছে। তাদের অসংখ্য পায়ের ছাপ এখানে পড়েছে।”

“না। ওধারে মোটা ক্যাম্বিশটা বিছিয়ে আমরা তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলুম।”

“চমৎকার।”

“আমার এই ব্যাগটাতে স্ট্রেকার আর সিমসনের এক পাটি করে জুতো আর সিলভার ব্লেজের একটা নাল আছে।”

“ইন্সপেক্টর, আপনার জুড়ি মেলা শক্ত।”

হোমস ব্যাগটা নিয়ে ডোবাটার মধ্যে নেমে গেল। তারপর সেই ক্যাম্বিশটা আর-একটু ডোবার মাঝখানে সরিয়ে নিল। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জমিটা খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

একসময়ে হোমস উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, “আরে, আরে, এটা কী ?”

জিনিসটা একটা আধপোড়া দেশলাই। কাদা লেগে একটা কাঠের টুকরোর মতো দেখাচ্ছে।”

“বুঝতে পারছি না কী করে জিনিসটা আমার চোখ এড়িয়ে গেল।” ইন্সপেক্টরের কথার ভাবে বোঝা গেল যে, তিনি নিজের ওপরে খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

“এটা কাদার তলায় ছিল, ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। আমি এটা খুঁজছিলুম বলেই দেখতে পেয়েছিলুম।”

“কী ! আপনি এটা পাবেন জানতেন ?”

“পাবই জানতুম না, তবে পাবার আশা করেছিলুম।” ব্যাগ থেকে জুতোগুলো বের করে হোমস সেখানকার পায়ের ছাপের সঙ্গে মেলাতে লাগল। তারপর ডোবা থেকে উঠে এসে ডোবার চারধার ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল।

ইন্সপেক্টর বললেন, “ওখানে আর কোনও পায়ের দাগ নেই। আমি চারদিকের একশো গজ জমির প্রত্যেকটি ইঞ্চি খুব ভাল করে পরীক্ষা করেছি।”

“ঠিক ঠিক। আপনি যখন বলছেন তখন আমি আর পরীক্ষা করে সময় নষ্ট করব না। তার চেয়ে আমি বরং একবার মাঠের চারপাশে একটু ঘুরে আসি। যাতে কাল সকালে আমার কাজের সুবিধে হয়। আমি এই নালটা সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে আমার কাছে রেখে দিচ্ছি।”

হোমসের কাজ করবার ধরন দেখে কী জানি কেন কর্নেল রস বিরক্ত আর অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। তিনি তাঁর হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলেন।

তিনি গ্রেগরিকে বললেন, “ইন্সপেক্টর, আপনি যদি আমার

সঙ্গে আসেন তো ভাল হয়। কয়েকটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। বিশেষ করে সাধারণ লোকের কথা ভেবে সিলভার ব্লেজের নাম দৌড় থেকে তুলে নেওয়া উচিত নয় কি ?"

হোমস বেশ জোর দিয়েই বলল, "মোটেই না। আমার মতে সিলভার ব্লেজের নাম থাকাই দরকার।"

কর্নেল হোমসের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আপনার মত জেনে খুশি হলুম। আমরা স্ট্রেকারের বাড়িতেই আছি। আপনি ঘুরে এলে সকলে মিলে একসঙ্গে ট্যাভিস্টকে ফিরব।"

ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল ফিরে গেলেন। আমি আর হোমস মাঠের দিকে চললুম। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চারপাশ গোধূলির আলোয় একেবারে ঝলমল করছে। হোমস কিন্তু এসব কিছুই দেখছিল না। নিজের চিন্তায় একদম বুঁদ হয়ে ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হোমস বলল, "দ্যাখো ওয়াটসন, ব্যাপারটাকেএই দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। জন স্ট্রেকারকে কে খুন করেছে, সে প্রশ্নটা এখন তোলা থাক। বরং ঘোড়াটার কী হল, সেই কথাটা আলোচনা করা যাক। ধরো, যখন জন স্ট্রেকারকে খুন করছিল তখন ঘোড়াটা পালায়। কিন্তু পালিয়ে গেল কোথায় ? ঘোড়ারা দলে থাকে। যদি সিলভার ব্লেজ পালিয়ে থাকে, তবে সে হয় কিংস পাইল্যাণ্ডেই ফিরে যাবে, নয়তো যাবে কেপলটন আস্তাবলে। এই ধুধু মাঠে ঘোড়াটা একা-একা ঘুরে বেড়াবে বলে মনে হয় না। আর তা যদি হত, তা হলে ঘোড়াটা কারও না কারও নজরে পড়ত। জিপসিরা কেন ওকে ধরে রাখতে যাবে ? জিপসিরা পুলিশের খপ্পরে পড়তে চায় না। ওরা নিশ্চয়ই জানে যে, ও ঘোড়াটাকে কারও কাছে বিক্রি করতে পারবে না। সুতরাং ঘোড়াটাকে ওরা যদি লুকিয়ে রাখে তো ওদের লাভ নেই, উলটে লোকসানের ভয়। এ-কথাটা মানবে তো ?"

"তা হলে ঘোড়াটা কোথায় ?"

"আমি তো আগেই বলেছি যে, ঘোড়াটা হয় কিংস পাইল্যাণ্ডে আছে, নয়তো কেপলটনে আছে। কিন্তু ঘোড়াটা কিংস পাইল্যাণ্ডে নেই, তা হলে নিশ্চয়ই কেপলটনে আছে। এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমরা একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি, কত দূর কী হয়। ইন্সপেক্টর বলছিলেন যে, এদিকের জমি একটু শক্ত। কিন্তু এখান থেকে তাকিয়ে দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে, কেপলটনের দিকে জমিটা ঢালু হয়ে গেছে। গত সোমবার রাত্রে ওই জায়গাটা নিশ্চয় বেশ ভিজে নরম হয়ে গিয়েছিল। আমরা যা ভেবেছি, তা যদি ঠিক হয়, তা হলে ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ওই ঢালুটার ওপর দিয়ে গেছে। আর ওই জায়গায় গিয়ে আমরা ঘোড়াটার পায়ের ছাপ আছে কি না দেখব।"

আমরা বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটছিলুম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ঢালু জায়গাটায় পৌঁছে গেলুম। হোমসের কথামতো আমি ঢালু জায়গাটার বাঁ দিক দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। হোমস গেল ডান দিকে। বড়জোর গজ-পঞ্চাশ গেছি, এমন সময় হোমস চেঁচিয়ে উঠল। তার দিকে তাকাতে দেখলুম যে, সে আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে। হোমসের সামনে ভিজে মাটিতে পর পর ঘোড়ার পায়ের ছাপ। হোমস পকেট থেকে নালটা বের করে ছাপের সঙ্গে মেলাল। হুবহু এক।

"কল্পনার ক্ষমতাটা দেখলে তো," হোমস বলল। "গ্রেগরির এই গুণটা নেই। ব্যাপারটা কী হতে পারে, সেটা আমরা কল্পনা করবার চেষ্টা করেছিলুম। তারপর সেই অনুযায়ী কাজ করেছি। আর তার ফল তো হাতেনাতে পেলুম। চলো এগোনো যাক।"

আমরা জলা জমিটা পেরিয়ে গেলুম। তারপর আধ মাইল মতো শুকনো ঘাসের একটা মাঠ। আবার একটা ঢাল। সেই ঢালের কাছে গিয়ে ফের ঘোড়ার পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। তারপর কিছু দূর পর্যন্ত কোনও ছাপ দেখতে পেলুম না। পায়ের ছাপ দেখা গেল কেপলটন আস্তাবলের কাছাকাছি এসে। হোমসই পায়ের ছাপটা দেখেছিল। হোমসের মুখ খুশিতে চকচক করছিল। ঘোড়ার পায়ের ছাপের পাশাপাশি একটি লোকের পায়ের ছাপ।

আমি বললুম, "ঘোড়াটা তো এতক্ষণ একা-একাই ছিল।"

"ঠিকই। একলাই ছিল। আরে আরে, এটা আবার কী ?"

জোড়া পায়ের ছাপ উলটো দিকে ঘুরে কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে গেছে। হোমস শিস দিয়ে উঠল। আমরা উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করলুম। হোমস ওই ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি মাঝে-মাঝে এদিকে ওদিকে দেখছিলুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম যে, পায়ের ছাপগুলো ফের কেপলটনের দিকে ঘুরে এসেছে।

আমি হোমসকে ডেকে দেখালুম। "ওহ্ ওয়াটসন, তুমি একটা বড় জিনিস আবিষ্কার করেছ। আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল। চলো, আমরা আবার ফিরে যাই।"

আমাদের বেশি দূর যেতে হল না। কেপলটন আস্তাবলের অ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তার মুখ পর্যন্ত পায়ের ছাপ বরাবর চলে এসেছে। আমাদের দেখতে পেয়ে একটা ছোকরা সহিস ছুটে এল।

সে বলল, "এখানে অচেনা লোকের ঘোরাঘুরি আমরা পছন্দ করি না।"

হোমস কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, "আমি একটা কথা জানতে এসেছি। আমি যদি কাল ভোর পাঁচটার সময়ে মিঃ সাইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, সেটা কি খুব সকাল-সকাল আসা হবে ?"

"না স্যার। এখানে যদি কেউ সকাল করে ওঠে তো তিনি মিঃ ব্রাউন। ওই তো উনি আসছেন। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।....না, না, আমি আপনার টাকা নিতে পারব না। উনি দেখতে পেলে আমার চাকরি চলে যাবে। পরে কোনও এক সময়ে আপনি যদি দিতে চান তো সে-কথা আলাদা।"

হোমস যখন হাফ-ক্রাউনটা পকেটে ঢোকাচ্ছিল তখন একজন জাঁদরেল চেহারার লোক একটা চাবুক দোলাতে দোলাতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। লোকটিকে দেখলে মনে হয় সদাই রেগে রয়েছে।

"ডাউসন, কী গুজগুজ ফুসফুস করছ। যাও, নিজের কাজে যাও। কী মশাই, আপনারা এখানে কী মতলবে ঘোরাঘুরি করছেন ?"

হোমস খুব ভদ্রভাবে বলল, "আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে চাই।"

"আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। এখানে অচেনা লোকের আমদানি আমরা মোটে পছন্দ করি না। এখান থেকে যাবেন, না কুকুরটা ছেড়ে দিতে হবে?"

হোমস সামান্য ঝুঁকে পড়ে সাইলাস ব্রাউনের কানে কানে কী যেন বলল। হঠাৎ লোকটির মুখটা রাঙা টকটকে হয়ে উঠল, "মিছে কথা। এ সম্পূর্ণ মিছে কথা!"

"বেশ। তা হলে এইখানেই ব্যাপারটার ফয়সালা করা যাক। নাকি বসবার ঘরে যাওয়া হবে?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি ভেতরেই আসুন।"

হোমস মুচকি হাসল। "ওয়াটসন, আমার বেশি দেরি হবে না।" তারপর বলল, "চলুন মিঃ ব্রাউন, ভেতরে যাই।"

প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে হোমস ফিরে এল। এত কম সময়ের মধ্যে কোনও লোকের চেহারা হাবভাব এত পালটাতে আমি কখনও দেখিনি। মিঃ ব্রাউনের মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। তার হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। হাতের চাবুকটা এমন দুলছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন ঝোড়ো বাতাস দিচ্ছে। তার সে হামবড়া ভাব আর নেই। হোমসের পিছনে পোষা কুকুরের মতো সে ঘুরঘুর করছিল।

"আপনার কথা-মতোই সব কাজ হবে," ব্রাউন বলল।

তার দিকে ফিরে হোমস বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু গোলমাল বা ভুল যেন না হয়।"

"না, না, কোনও গোলমাল হবে না। ওখানে ঠিক হাজির হবে। ওটাকে কি আমি আগেই পালটে ফেলব?"

হোমস একটুখানি চিন্তা করে হাসতে হাসতে বলল, "না, পালটাবে না। ...এ ব্যাপারে আমি পরে জানাব। ...তবে ভাল কথা, কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না।"

"না, না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।"

"তোমার নিজের জিনিস হলে যে-ভাবে দেখাশোনা করতে, সেই ভাবে দেখবে।"

"সে-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"বেশ। কালই আমি খবর দেব।" বলে হোমস কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

"বুঝলে ওয়াটসন, একই সঙ্গে গুণ্ডা অথচ নীচ আর ভিতুর ডিম এই তিন ধরনের লোককে এক সঙ্গে মেলালে যে লোকটির চেহারা পাওয়া যাবে, সে হচ্ছে এই ব্রাউন।"

"তা হলে ঘোড়াটা ওর আস্তাবলেই আছে?"

"প্রথমে ও অবশ্য সব কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। তখন আমি ওকে সেদিন সকালে যা-যা ঘটেছিল সব বললুম। বললুম, ঘোড়ার পায়ের ছাপের পাশে-পাশে যে চৌকো জুতোর ছাপ আছে, তা তার পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলে গেছে। আমি ওকে আরও বললুম, ভোরে সে যখন একটা ঘোড়াকে ঘুরে বেড়াতে দ্যাখে, তার কী মনে হয়েছিল। তারপর বললুম, যখন ঘোড়াটার কপালে সাদা দাগ দেখে ও বুঝতে পারে যে ওটা সিলভার ব্লেজ, তখন ওর কী মনে হয়েছিল। তারপর প্রথমে সে ঘোড়াটাকে নিয়ে যখন কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিল, তার মাথায় কীভাবে বদবুদ্ধি চাপল। ঘোড়াটাকে দৌড়ের সময় গায়েব করে দিতে পারলে তার নিজের ঘোড়ার কী সুবিধে হবে। আর এই ভেবে সে আবার ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে আসে। যখন সব কথা খুলে বললুম, তখন ওর একমাত্র চিন্তা হল কী করে নিজেকে বাঁচানো যায়।

"কিন্তু ওর আস্তাবলে তো পুলিশ খোঁজ করে এসেছিল।

"ওর মতো একজন ঝানু লোকের পক্ষে একটা ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখাটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

"কিন্তু ঘোড়াটা ওর জিম্মায় রেখে আসাটা কি ঠিক হল? ঘোড়াটার কোনও ক্ষতি হলে তো ওরই লাভ।"

"না হে, না। এখন ঘোড়াটাকে ও প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে। কেননা, ও জানে যে, ওর বাঁচবার একমাত্র পথ হল ঘোড়াটাকে বহাল তবিয়তে রাখা।"

"কিন্তু কর্নেল রস এ-ব্যাপারে ব্রাউনকে ক্ষমা করবেন বলে মনে হয় না।"

"এটা কর্নেল রসের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ছে না। আমি আমার মতে কাজ করব। যতটুকু কর্নেলকে বলা দরকার বলে মনে করব, আমি ততটাই বলব। স্বাধীন ভাবে কাজ করবার এইটেই সুবিধে। তুমি লক্ষ করেছ কি না জানি না, কর্নেল আমার সঙ্গে একটু মুরুব্বিয়ানা করছেন। এখন আমি ওঁকে একটু লেজে খেলাব। ঘোড়ার কথা ওঁকে কিছু বোলো না।"

"নিশ্চয়ই না। তোমার মত না নিয়ে কোনও কথা বলব না।"

"তবে এই ঘোড়া উদ্ধারের ব্যাপারটা তো আসল কথা নয়। আসল কথা হল, কে জন স্ট্রেকারকে খুন করল।"

"এবার তুমি ওই সমস্যার সমাধানে মন দেবে।"

"না, ঠিক উলটোটা আমরা আজ রাতের ট্রেনেই লণ্ডন ফিরে যাব।"

হোমসের কথা শুনে আমার মনে হল যে, আমার মাথায় বাজ পড়ল। আমরা এই তো ক'ঘন্টা আগে ডেভনশায়ারে এসে পৌঁছেছি। হোমস আসতে-না-আসতেই একটা জট খুলে ফেলেছে। আর ঠিক যখন ব্যাপারটা জমে উঠছে, তখনই কেন যে হোমস ফিরে যেতে চাইছে আমি বুঝতে পারলুম না। কিন্তু হাজার চেষ্টা করে হোমসের কাছ থেকে আর কোনও কথা বের করতে পারলুম না। আমরা চুপচাপ স্ট্রেকারের বাড়িতে ফিরে এলুম। কর্নেল আর ইন্সপেক্টর বৈঠকখানায় বসে ছিলেন।

"আমরা আজ মাঝরাতের ট্রেনে লণ্ডন ফিরে যাব। আপনাদের ডার্টমুরের সুন্দর আবহাওয়া খুব উপভোগ করলুম।" হোমস বলল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধাঁধা

ছোট্‌কা নাকি সত্যিই এমন দু'জন লোকের কথাবার্তা শুনেছে। ট্রামের যে-সিটে বসেছিল ছোট্‌কা, তার ঠিক সামনের সিটে বসে ছিল ওই দু'জন লোক। জ্যামে আটকে ট্রামটা শুধু মৌলালি পেরোতেই নিয়েছিল আধ ঘণ্টারও বেশি সময়। বিরক্ত হয়ে সবাই প্রায় হাঁটতে শুরু করেছিল। প্রায়-ফাঁকা সেই ট্রামে ছোট্‌কার কানে-আসা সংলাপ থেকে তৈরি হয়েছে এবারের ধাঁধা। ছোট্‌কা নাকি শেষটা শোনেনি, মানে উত্তরটা। কিন্তু যেটুকু শুনেছে, তাতেই মনে হয়েছে, দু'জনের মধ্যে একজন দারুণ বুদ্ধিমান। সে-ই কথাটা বলেছে। কথাটা কী বলি এবার। কেননা, সেই সংলাপেই লুকনো রয়েছে ধাঁধা।

ক-বাবু : তুমি তো তিনশো টাকার বেশি পাবে, তাই না? কত পাবে ঠিক?

খ-বাবু : তিনশো টাকাই দাও না। তাতেই চলবে।

ক-বাবু : এই নাও, এই খামে একটা চেক আছে। তিনশো টাকার বেশি অঙ্কেরই চেক এটা। খুলো না। তার আগে একটা কথার জবাব দাও।

খ-বাবু : বেশ। খুলছি না। কথাটা বলো।

ক-বাবু : তুমি যদি এই চেকটাকে না ভাঙাও, তা হলে এক্ষুনি আমি তোমাকে কিছু নগদ টাকা দেব। কিন্তু কথা দিতে হবে, চেকটা ভাঙাবে না।

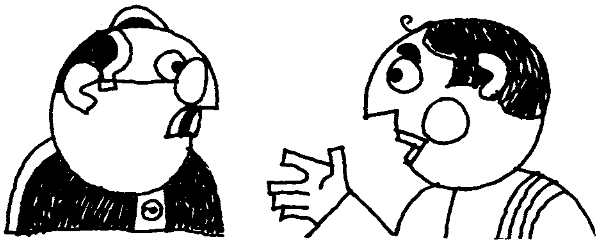

খ-বাবু : কত দেবে নগদ?

ক-বাবু : এই চেকের টাকা যে-তিনটে অঙ্ক দিয়ে লেখা সেই অঙ্ক তিনটের গুণফল থেকে অঙ্ক তিনটের যোগফল বাদ দিয়ে যত হবে, তত টাকা দেব নগদে। কিন্তু আগাম কথা চাই।

খ-বাবু : ঠিক তো? রাজি, আমি রাজি।

ক-বাবু : বেশ তা হলে চেকটা খুলে দ্যাখো।

খ-বাবু চেক খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন। এ কী, এ তো ডাহা লস। আমি তো তা হলে কিছুই পাব না নগদে।

ব্যস, এই অবধি।

এবার বলো, চেকটা যদি তিনশো টাকার বেশিই হয়ে থাকে, তা হলে কত বেশি? কত টাকার চেক ছিল? এটাই প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ শব্দের শুরু বা শেষ নাই?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

বিভোসীলাজন

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১২০ কি· মি। ঘণ্টায় ২৪ কি· মি বেগে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছবে টেম্পোটা। (২) বাইরের দিকে। (৩) পরশপাথর। **সত্যসন্ধ**

শব্দ-সন্ধান

১		২		৩		৪
	■		■		■	
	■	৫	৬		■	
৭	৮	■		■	৯	
১০		■		■	১১	
	■	■		■	■	
১২						

এবারের শব্দসন্ধানে ১, ১, ৪ ও ১২ নম্বর সংকেত-সূত্রে চারজন অতি বিখ্যাত বাঙালির নাম লুকনো রয়েছে। এঁদের প্রত্যেকের পদবি এক, কিন্তু একজনের পদবিটা ইংরেজি-মতে বসাতে হবে। অন্য সংকেতগুলো ধরে এগোলেই ছক পূরণের কাজটা সহজতর হবে।

অন্যান্য সংকেত : **পাশাপাশি** : (৫) ইরান। (৭) বিলাপধ্বনি। (৯) নৌচালন-প্রতিযোগিতা। (১১) মৃদঙ্গ। **উপর-নীচ** : (২) পর্বত-অভিযানে পথপ্রদর্শক। (৩) দুর্বোধ্য গোপন তথ্য। (৬) হাসির লেখা। (৮) বিশালকায় প্রাণী। (৯) প্রতিকূল।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

কৃ	য	ক	■	ট	হ	ল
পা	ণ্ড	ব	■	গ	য়	লা
ণ	■	চ	তু	র	■	ট
■	হা	■	র	■	ম	■
■	তা	ল	পু	কু	র	■
■	হা	■	ন	■	ক	■
জ্যো	তি	ষ্ক	■	ব্র	ত	তি

রঞ্জন

মজার খেলা

পনেরোটা পোড়া দেশলাইকাঠি বা টুথপিক লাগবে খেলাটাকে সাজাবার জন্যে। সুতরাং খেলাটা কী জানার আগে কাঠিগুলোকে জোগাড় করে ফেলো।

করেছ ? বেশ এবার নীচের ছবির মতন টেবিলের উপর সাজিয়ে ফেলো—

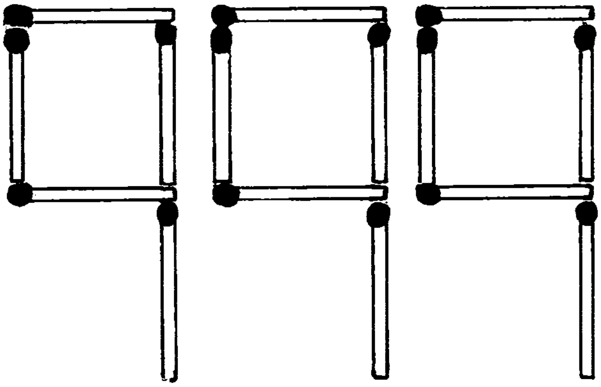

কী লিখলে বলো তো ? ৯৯৯। তাই তো ?

বেশ। এবার বন্ধুদের বলো, এই ৯৯৯ সংখ্যাটা হল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জরুরি টেলিফোনের নম্বর। ওই দ্বীপপুঞ্জে জরুরি প্রয়োজনে সবাই এই নম্বরটা ডায়াল করে।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ জায়গাটা যদি অপছন্দ হয়, তা হলে যে-কোনও একটা জায়গার নাম পছন্দ করে ব্যাপারটাকে চালিয়ে দাও। কেননা, আসল প্রশ্নটার সঙ্গে এ-জায়গার কোনও সম্পর্ক নেই। এই ৯৯৯-কে বদলে এমন-একটা চেহারা দিতে হবে যাতে সেটা 'আপৎকালীন বার্তা-সঙ্কেত'-এ পরিণত হয়। আর সেই পরিবর্তন ঘটাবার জন্য একটা কাঠি যোগ করা যাবে, তিনটে কাঠিকে এদিক থেকে ওদিকে ইচ্ছেমতো সরিয়ে ফের বসানো যাবে।

ঠিক বুঝতে পারোনি বোধহয়। আসলে, আপৎকালে সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠানোর সঙ্কেতকে বলে 'SOS'। আর এটা জানা থাকলেই সমাধানটা হয়ে পড়ে সহজ। কীভাবে, নীচের ছবিতে দ্যাখো—

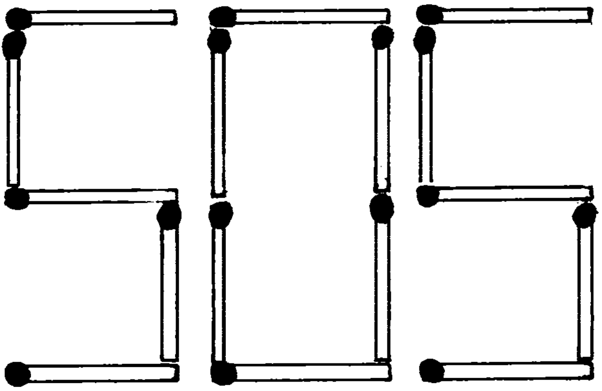

SOS-এর পুরো কথাটা হল 'Save our Souls'. কখন, কোথায়, কীভাবে এর ব্যবহার, অভিধান থেকে দেখে নিয়ো।

মজারু

হাসিখুশি

"অমলবাবু, আপনার ঘাড়ের যন্ত্রণার চিকিৎসার জন্য আমাকে যে-চেকটা দিয়েছিলেন, ওটা ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে।"

"বলব কী ডাক্তারবাবু, আপনি যে-যন্ত্রণাটার চিকিৎসা করেছিলেন ওটাও ফেরত এসেছে।"

"লণ্ডনে বাঘ-শিকারি হিসেবে দাদুর খুব নামডাক।"

"কিন্তু লণ্ডনে তো বাঘই নেই !"

"থাকবে কী করে ? দাদুই তো সব মেরে ফেলেছেন।"

"তাতান তো খুব শান্তশিষ্ট ছেলে, ওর হাত-পা ভাঙল কী করে ?"

"ইলেকট্রিক পোস্টে ডেঞ্জার কথাটার বানান ভুল ছিল, সেটা ঠিক করতে গিয়েই তো।"

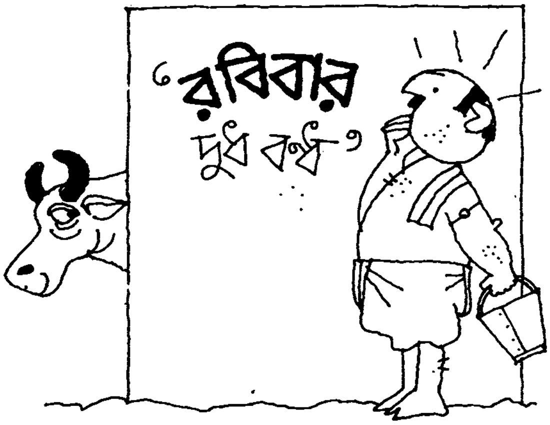

"দিনে দু লিটার করে একটি গোরু দুধ দিলে, সপ্তাহে কত দেবে তাতাই ?"

"বারো লিটার স্যার।"

"কেন ?"

"রবিবার ছুটির দিন না ?"

"শতকরা কুড়িটি বাস-দুর্ঘটনা ঘটে ট্র্যাফিক আইন না-মেনে চালানোর জন্য।"

"শতকরা আশিটি দুর্ঘটনা যদি ট্র্যাফিক আইন মেনেই হয়ে থাকে, তা হলে ট্র্যাফিক আইন মানার দরকারটা কী ?"

ছবি : দেবাশিস দেব

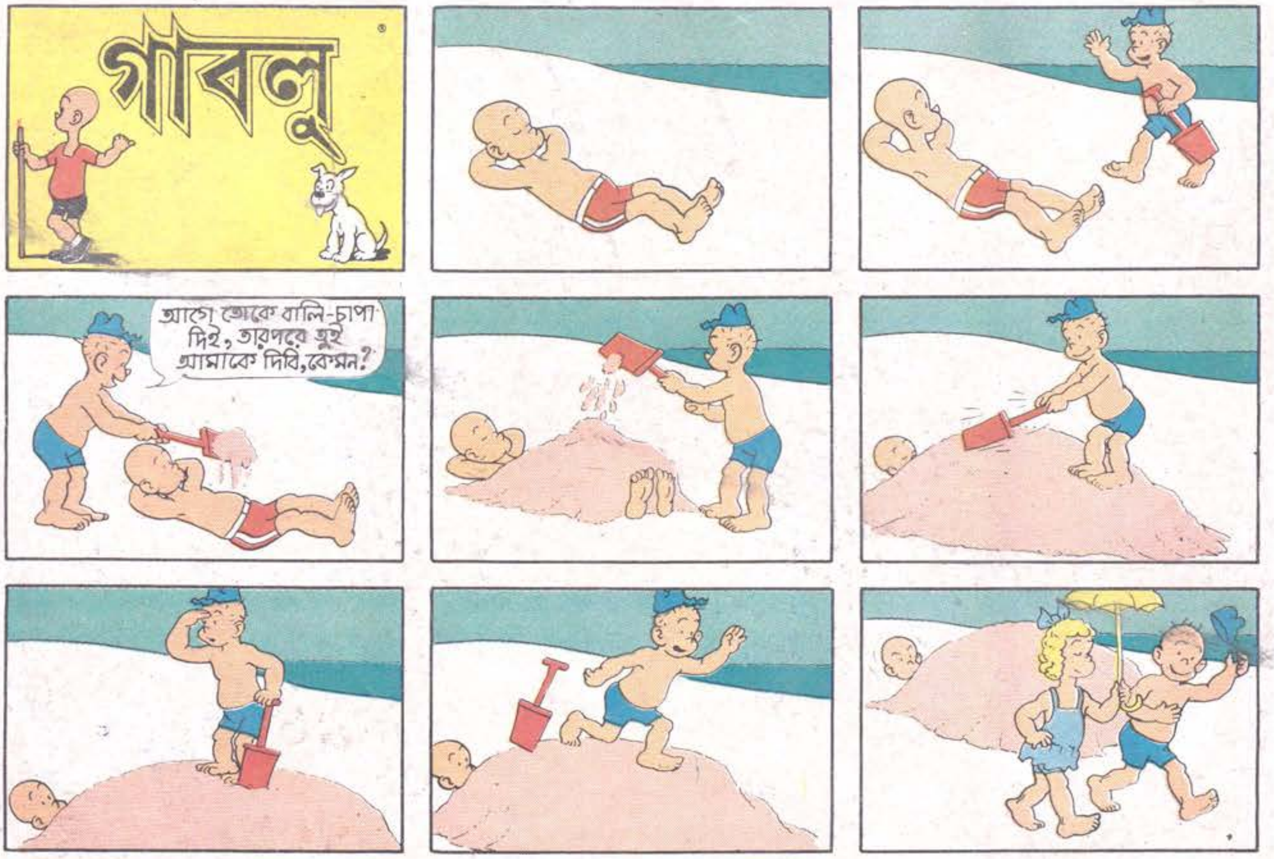
গাবলু
আগে তোকে বালি-চাপা দিই, তারপরে তুই আমাকে দিবি, কেমন?

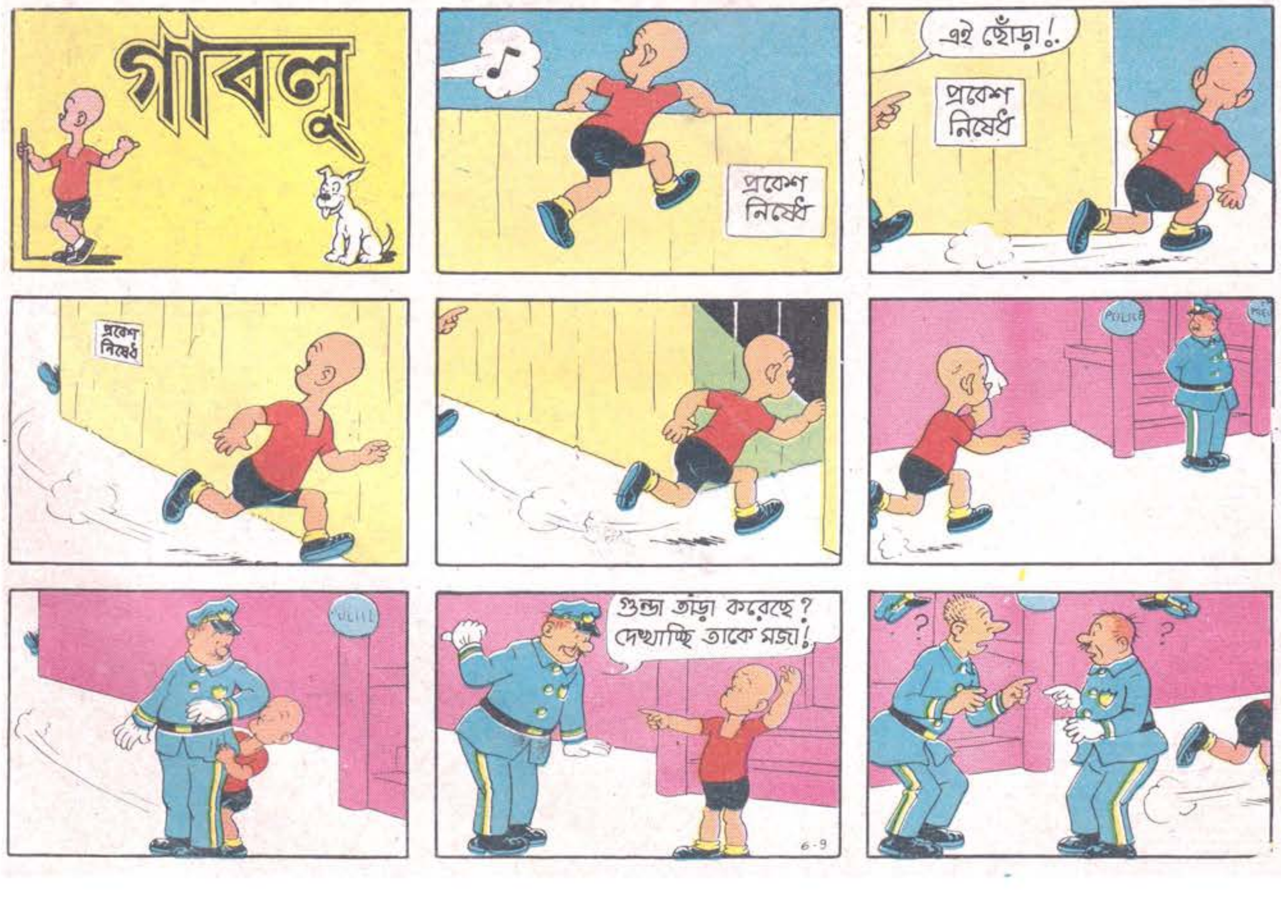
গাবলু
প্রবেশ নিষেধ
এই ছোঁড়া!
প্রবেশ নিষেধ
প্রবেশ নিষেধ
POLICE
গুন্ডা তাড়া করেছে? দেখাচ্ছি তাকে মজা!
?
?
6-9

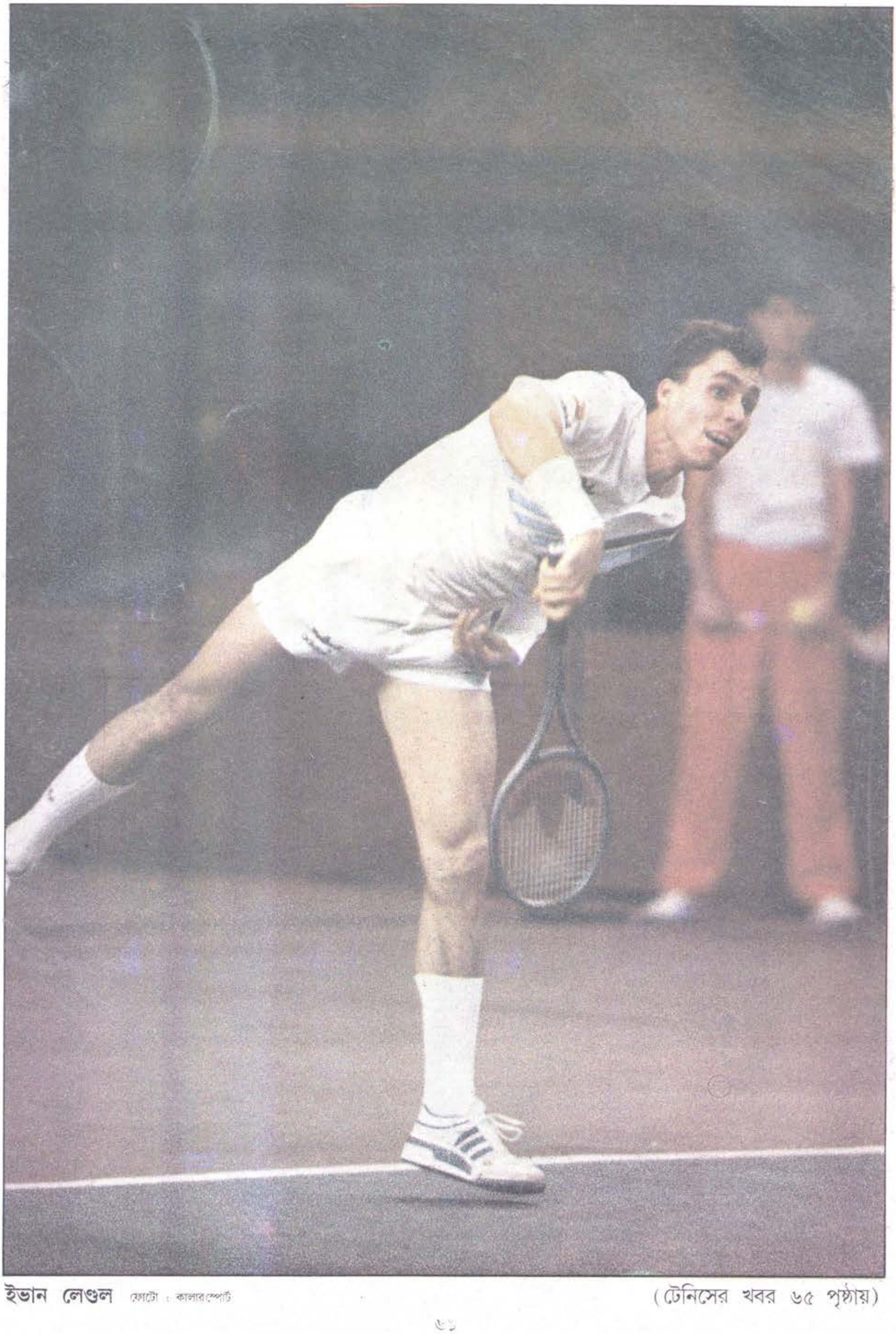

ইভান লেণ্ডল ফোটো : কালারস্পোর্ট

(টেনিসের খবর ৬৫ পৃষ্ঠায়)

বিশ্বকাপ ফুটবলের ঘণ্টা বাজছে

অভিষেক রায়

খেলাধুলো যাঁরা ভালবাসেন, বিশেষ করে ফুটবল, এই উনিশশো ছিয়াশি সালের দিকে তাঁরা যে সাগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন, এতে আর আশ্চর্য কী। কারণ এই বছরেই মেক্সিকোতে শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল, যার অন্য নাম ফিফা কাপ। বিশ্বকাপে অংশ নেবে পৃথিবীর সেরা ২৪টি দেশ। 'এ' থেকে 'এফ' এই ৬টি গ্রুপের প্রত্যেকটিতে খেলবে ৪টি করে দেশ। ৬টি গ্রুপেই একটি করে দেশকে বাছাই হিসেবে রাখা হয়েছিল। এই বাছাই দেশগুলি হচ্ছে ইতালি, মেক্সিকো, ফ্রান্স, ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি ও পোল্যাণ্ড। তারপর প্রত্যেক গ্রুপে কারা কারা খেলবে, তা ঠিক করা হল লটারির মাধ্যমে। আর এই লটারিটা এবার কে করেছে জানো? পাঁচ বছরের একটি ছেলে লুই জেভিয়ার বারোজা এ নেডো। ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপে লটারিতে গ্রুপ ভাগের কাজটি করেছিলেন এই ছেলেটির মা মোনিকা মারিয়া। এবার দেখা যাক গ্রুপটা কেমন হয়েছে। 'এ' গ্রুপে রয়েছে—ইতালি, বুলগারিয়া, আর্জেণ্টিনা ও দক্ষিণ কোরিয়া। যেহেতু প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি করে দেশ উঠবে, তাই মনে হয় 'এ' গ্রুপ থেকে ইতালি এবং '৭৮-এর চ্যাম্পিয়ান আর্জেণ্টিনা পরের রাউণ্ডে যাবে। সত্যি বলতে কী, 'এ' গ্রুপটা বেশ সহজই হয়েছে ইতালির পক্ষে। 'বি' গ্রুপে রয়েছে—মেক্সিকো, বেলজিয়াম, প্যারাগুয়ে ও ইরাক। এবার মেক্সিকোই উদ্যোক্তা দেশ, তাই দর্শকদের সমর্থন ছাড়াও চেনা পরিবেশে খেলার বাড়তি সুযোগ পাবে তারা। সুতরাং মেক্সিকোর পাল্লা কিছুটা ভারী। দ্বিতীয় দেশ হিসেবে এই গ্রুপ থেকে পশ্চিম এশিয়ার ইরাক যদি অপ্রত্যাশিতভাবে উঠে আসে, অবাক হবার নেই। অন্তত এশিয়ার

১৯৩৮ সালে এই ছোট্ট ছেলেটিকে দিয়ে লটারিতে গ্রুপ ভাগ করানো হয়েছিল

বিশ্বকাপ-ফুটবলের প্রবাদ-পুরুষ পেলে

উয়ে সিলারের (পশ্চিম জার্মানি) পা থেকে বল কেড়ে নিচ্ছেন লেভ ইয়াসিন (রাশিয়া)। ১৯৬৬

বেকেনবাউয়ার (পশ্চিম জার্মানি)

মারাদোনা (আর্জেন্টিনা)

মানের নিরিখে ইরাক যে প্রচুর এগিয়েছে এতে কোনও ভুল নেই। 'সি' গ্রুপে রয়েছে—ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গারি ও কানাডা। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ইউরোপ-চ্যাম্পিয়ান ফ্রান্স এই বিভাগ থেকে উঠবে, তা হলে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে দারুণ লড়াই হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং হাঙ্গারির মধ্যে। বিশ্বকাপ ফুটবলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখনও তেমন সাড়া জাগায়নি। কিন্তু হাঙ্গারি নামটি শুনলেই জাগে একরাশ শ্রদ্ধা। '৩৮ এবং '৫৪ দু'বার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও হাঙ্গারি হেরে যায় যথাক্রমে ইতালি এবং পশ্চিম জার্মানির কাছে। ফুটবল ঐতিহ্যের কথা মাথায় রাখলে, এই গ্রুপের সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে হাঙ্গারিকে চট করে মুছে ফেলা যাবে না। 'ডি' গ্রুপে রয়েছে ব্রাজিল, স্পেন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও আলজিরিয়া। এই বিভাগেও লড়াই হবে। '৫৮, '৬২ এবং '৭০ এই তিনবারের চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিল পুরোশক্তির দল তৈরির ব্যাপারে অসুবিধেয় পড়েছে। সারা বিশ্ব আগ্রহে তাকিয়ে আছে, এই অসুবিধে কাটিয়ে উঠে ব্রাজিল কেমন খেলে সেটাই সকলের প্রশ্ন। স্পেন এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ড অঘটন ঘটানোর মতো ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সব থেকে ভয় আলজিরিয়াকে। '৮২ সালে আলজিরিয়া কী দুর্দান্ত খেলেছিল তা হয়তো অনেকেরই মনে আছে। সব থেকে কঠিন লড়াই হবে 'ই' গ্রুপে। পশ্চিম জার্মানি, স্কটল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও উরুগুয়ে, সব ক'টি টিমই মোটামুটি ব্যালান্সড। বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানি ও উরুগুয়ে, দুটি দেশেরই যথেষ্ট সুনাম। মনে হয় এই দুটি দেশই গ্রুপে উঠবে। 'এফ' গ্রুপে আছে—ইংল্যাণ্ড, পর্তুগাল, পোল্যাণ্ড, মরক্কো। '৬৬-র চ্যাম্পিয়ান ইংল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড এই গ্রুপে সবচেয়ে শক্তিশালী দল। তবে পর্তুগালকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

যোহান ক্রুইফ (হল্যাণ্ড)

৬টি গ্রুপ থেকে দুটি করে টিম অর্থাৎ ১২টি দলের সঙ্গে তৃতীয় সেরা চারটি দলসহ মোট ১৬টি দল নিয়ে এরপর শুরু হবে আসল লড়াই।

বাধা কাটিয়ে ববি মুর (ইংল্যাণ্ড) বল নিয়ে এগোচ্ছেন

ভুতুড়ে ঘড়ি
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
গোসাঁইবাগানের ভূত
রাতের প্রহরী
টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সব ভুতুড়ে লীলা মজুমদার

পাঁচমুণ্ডির আসর ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । ৮·০০
গোসাঁইবাগানের ভূত ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১০·০০
ভুতুড়ে ঘড়ি ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১০·০০
রাতের প্রহরী ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । ১০·০০
টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । ৮·০০
সব ভুতুড়ে ॥ লীলা মজুমদার । ১৬·০০

ভূতেরা কোথায় থাকে ?
এর উত্তরে ভূত-বিশ্বাসীরা কী বলবে বলো তো ? বরং তারা উল্টো প্রশ্ন করবে, ভূতেরা কোথায় না থাকে ? সত্যি বলতে কী, তর্ক করে এর কোনো মীমাংসা হবে না ।
কিন্তু একটা কথা সক্কলে স্বীকার করবে—সে তারা ভূতে বিশ্বাসী হোক, কিংবা হোক ভূতে অবিশ্বাসী—যে, একটা জায়গায় হাত বাড়ালেই ভূতের দেখা পাওয়া যায় ।
কোন্ জায়গা জানো ?

হাত বাড়ালেই ভূত

জায়গাটা হল, বইয়ের তাক ।
হ্যাঁ, বইয়ের তাকেই ভূত রয়েছে । শুধু একটু কাছে ডেকে নেওয়া । তাহলেই দেখবে, কেমন সুড়সুড় করে নানা ধরনের ভূত এসে ঠিক হাজির হবে । কেউ-বা আলেয়াভূত, কেউ-বা পাখিভূত, কেউ-কেউ ব্রহ্মদত্যি । কেউ নিপাট ভালমানুষ, কেউ খুব দুষ্টু । কোনো ভূত যদি অঙ্ক কষে দেয়, কোনো ভূত খুঁজে দেয় গুপ্তধন । আর এইসব নানান ধরনের নানান চেহারার নানান চরিত্রের ভূতেরা যেসব বইতে রয়েছে সেইসব বইয়ের নামগুলো তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি ।

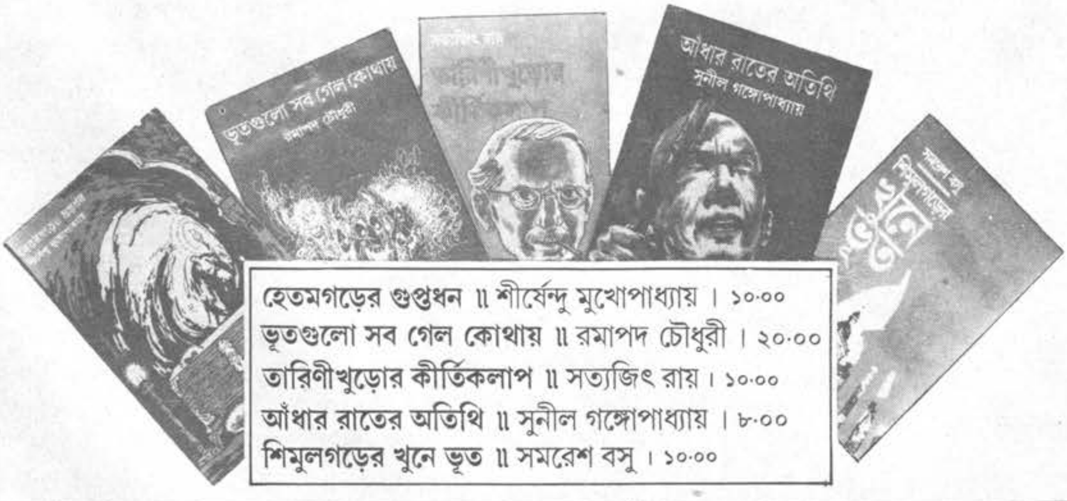
ভূতগুলো সব গেল কোথায়
রমাপদ চৌধুরী
সত্যজিৎ রায়
তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ
আঁধার রাতের অতিথি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সমরেশ বসু
শিমুলগড়ের খুনে ভূত

হেতমগড়ের গুপ্তধন ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১০·০০
ভূতগুলো সব গেল কোথায় ॥ রমাপদ চৌধুরী । ২০·০০
তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ ॥ সত্যজিৎ রায় । ১০·০০
আঁধার রাতের অতিথি ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । ৮·০০
শিমুলগড়ের খুনে ভূত ॥ সমরেশ বসু । ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

সেরাদের সেরা লেণ্ডল

অশোক রায়

টেনিসের বিস্ময়-বালক বরিস বেকার উইম্বলডন জিতে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তিনি মাস্টার্স প্রতিযোগিতায় ফাইনালে হেরে যান।

সেরা ১৬ জন খেলোয়াড়কে নিয়েই মাস্টার্স টেনিস টুর্নামেণ্ট হয়। তাই এই টুর্নামেণ্টে জিতে সেরাদের সেরা হবার চেষ্টা থাকে সকলের মধ্যে। এবারের মাস্টার্সেও সকলেই হাজির ছিলেন। শুধু শেষ মুহূর্তে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত জিমি কোনর্স নাম তুলে নেওয়ায় ইকোয়েডরের ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ খেলোয়াড় আঁদ্রেজ গোমেজ খেলার সুযোগ পান। বছরের শেষ প্রতিযোগিতা বলেই নয়, মোট পুরস্কারের পরিমাণও ছিল ৫ লক্ষ ডলার, যা টেনিস প্লেয়ারদের আকর্ষণ করার পক্ষে নেহাত কম নয়।

ইভান লেণ্ডল (মাস্টার্স-চ্যাম্পিয়ান)

প্রতিযোগিতায় শুরু থেকেই অপ্রত্যাশিত ফল ফলতে আরম্ভ হয়। কোনর্সের বদলে খেলতে নেমে প্রথমেই ১৩ নম্বর বাছাই ফ্রান্সের অঁরি লেঁকতেকে ছিটকে দেন গোমেজ। অস্ট্রেলীয় ওপেন চ্যাম্পিয়ান এবং ৫ নম্বর বাছাই সুইডেনের স্টেফান এডবার্গকে পরাজিত করে বিস্ময় জাগান জোহান ক্রিয়েক। প্রথমবার মাস্টার্সে খেলতে এসে এডবার্গ রীতিমত নার্ভাস ছিলেন।

কিন্তু এর পরের ম্যাচেই ইন্দ্রপতন। বিশ্বের দু'নম্বর খেলোয়াড় জন ম্যাকেনরো অভাবিতভাবে হেরে গেলেন ১৮ নম্বর বাছাই স্বদেশের ব্রাড গিলবার্টের কাছে। এই হারের ফলে উপর্যুপরি তিনবার মাস্টার্স খেতাব জেতার এবং টানা চারবার ফাইনাল খেলার স্বপ্ন মুছে গেল ম্যাকেনরোর।

ম্যাকেনরো পরাজিত হওয়ায় এবং কোনর্স নাম তুলে নেওয়ায় সবচেয়ে সুবিধে হয়ে গেল লেণ্ডলের। টিম মেয়োটকে হারিয়ে সেমিফাইনালে লেণ্ডল মুখোমুখি হলেন উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা গোমেজের। অন্য সেমিফাইনালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান এবং প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বাছাই বরিস বেকার সম্মুখীন হলেন অষ্টম বাছাই সুইডেনের অ্যাণ্ডার্স ইয়ারিডের।

সেমিফাইনালে জব্বর লড়াই করে ফাইনালে পৌঁছলেন পাওয়ার টেনিসের দুই সর্বোত্তম খেলোয়াড় ইভান লেণ্ডল এবং বরিস বেকার। লেণ্ডল ৬-৪, ৭-৫ গেমে গোমেজকে হারিয়ে টানা ৬ বার ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন। ওদিকে 'বিস্ময়-বালক' বেকার জেতেন ইয়ারিডের বিরুদ্ধে ৬-৩, ৬-৪ গেমে। মাস্টার্সে প্রথম খেলতে নেমে প্রথমবারেই বেকার উঠলেন ফাইনালে।

লেণ্ডল এবং বেকারের লড়াই মানেই তাক-লাগানো, চোখ-ধাঁধানো টেনিস। কিন্তু দর্শকদের সমর্থন সত্ত্বেও বেকার তেমন কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না লেণ্ডলের সামনে। ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের যুদ্ধে লেণ্ডল স্ট্রেট সেটে জিতলেন ৬-২, ৭-৬, ৬-৩ গেমে। এই নিয়ে লেণ্ডল মাস্টার্স খেতাব জিতলেন তিনবার ('৮১, '৮২, '৮৫) এবং বেকারের বিরুদ্ধে জিতলেন ৪টি সাক্ষাৎকারের সবক'টিতেই। এই জয়ের ফলে লেণ্ডল পেলেন ১ লক্ষ ডলার। শুধু '৮৫ মরসুমেই টেনিস খেলে তাঁর আয়ের পরিমাণ দাঁড়াল (শুধু প্রাইজ মানি বাবদ) সাড়ে তিন কোটি টাকা। এবং এই মরসুমে তিনি প্রথম যুক্তরাষ্ট্র খেতাবসহ জিতলেন ১১টি প্রতিযোগিতা। প্রমাণ করে দিলেন লেণ্ডল, কেন তিনি এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর।

ক্রিকেটারদের গল্প

নৃপতি চৌধুরী

ক্রিকেট মাঠে আমরা যাই খেলা দেখতে। সেইসঙ্গে প্রিয় ক্রিকেটারদের এক ঝলক দেখে নিতে। পছন্দসই ক্রিকেটাররা রান করলে, উইকেট নিলে কিংবা ক্যাচ ধরলে, বলা বাহুল্য, আমরা খুশি হই। কিন্তু চট্ করে যেগুলোর কাছাকাছি তোমরা যেতে পারো না, ক্রিকেটারদের জীবনের সেইরকম মজার মজার ঘটনার কাছাকাছি তোমাদের যদি নিয়ে যাওয়া হয়, কেমন লাগবে ? শুনতে লোভ হচ্ছে ?

সানি মানেই রেকর্ড। ব্যাট হাতে কোন্ রেকর্ডটাই বা তাঁর ভাঙতে বাকি আছে ! কিন্তু ব্যাট ছাড়াও সানির একটা বিশ্বরেকর্ড আছে, যেটা মনে হয় কোনও দিনই কেউ ভাঙতে পারবে না।

১৯৭৪ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ব্যাট করছিলেন সুনীল গাওস্কর। মাঠে বেশ হাওয়া বইছিল সেদিন। সানি ব্যাট করছিলেন মাথায় টুপি না পরেই। প্রবল হাওয়ায় বারেবারে চোখের ওপর এসে পড়ছিল তাঁর মাথার এক গোছা চুল। এক সময় গাওস্কর এগিয়ে গেলেন আম্পায়ার ডিকি বার্ডের কাছে। বললেন, "আপনার কাছে কাঁচি আছে ?" বার্ড একটু অবাক হয়েই পালটা প্রশ্ন করলেন, "কাঁচি নেই। ব্লেড আছে, চলবে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওতেই হবে," গাওস্কর আর-একটু এগিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললেন, "আমার মাথার এই চুলের গোছাটা একটু কেটে দিন।"

বার্ড প্রথমে কথা শুনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। পরে চুল কাটতে কাটতে ঠাট্টা করে বললেন, "আম্পায়ারদের এখন কত রকমের কাজই করতে হচ্ছে।"

টেস্টম্যাচ চলাকালীন মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে চুল কাটার রেকর্ড আর কোন্ ক্রিকেটারের আছে ? তোমরা খুঁজে বার করার আগে শেষ কথাটা তোমাদের জানিয়ে দিই, ওই ইনিংসে গাওস্কর সেঞ্চুরি করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম শতরান।

* * *

সেলিম দুরানির নাম শুনেছ ? ভারতের দুর্দান্ত এই অলরাউণ্ডারটিকে সহ-খেলোয়াড়রা সকলেই খুব ভালবাসতেন। ব্যাট হাতে যেমন পিটতে পারতেন, বল হাতে স্পিনের ভেল্কিতে তেমনি নাড়িয়ে দিতেন বহু বড়-বড় ব্যাটসম্যানের ডিফেন্স। ১৯৭০-৭১ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে দুরানি আর দিলীপ সরদেশাই ছিলেন হোটেলের একই ঘরে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় পাবার পরে হোটেলের ঘরে দুরানি বসে আছেন, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝন্ঝন্ করে।

"হ্যালো, দিলীপ সরদেশাই আছেন ?" এক অপরিচিত কণ্ঠে প্রশ্ন।

"দুঃখিত, উনি ঘরে নেই।" দুরানি ফোন নামিয়ে রাখতে যাবেন, অপরিচিত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন, "আচ্ছা, উনি কখন ফিরবেন বলতে পারেন ? আমি ওঁর একজন ফ্যান। ওঁকে আমি একটা টেপ-রেকর্ডার উপহার দেব বলে··· আচ্ছা আপনি কে কথা বলছেন ?"

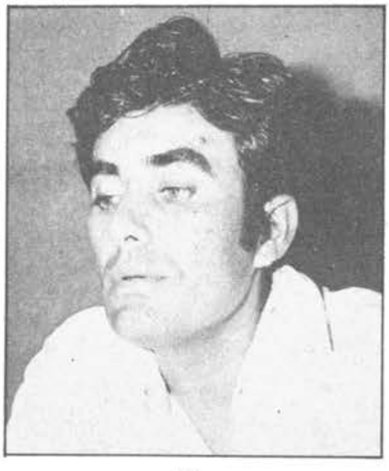

"আমি সেলিম দুরানি, দিলীপের রুম-মেট।"

টেলিফোনের ও প্রান্তে যেন খুশি ছড়িয়ে পড়ল, "ও আপনি দুরানি ! কী সৌভাগ্য। আপনি যে-বলে সোবার্সকে আউট করেছেন, তার কোনও তুলনা নেই। সোবার্স আর লয়েডকে আউট করেই আপনি ভারতকে প্রথম জয় পাইয়ে দিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। আমার কাছে আরও একটা টেপ-রেকর্ডার আছে, ওটা আমি আপনাকে দিতে চাই। দয়া করে একটু নীচে আসবেন, দুটো টেপই তা হলে আপনাকে দিয়ে দিতে পারি।"

ঘরের মধ্যে দুরানি শর্টস পরে বসে ছিলেন। টেপ পাবেন শুনে তাড়াতাড়ি ভাল জামা-প্যান্ট পরে, ইণ্ডিয়া-টাইটা গলায় বেঁধে গম্ভীরভাবে নীচে এলেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। দুরানি এনকোয়ারিতে জিজ্ঞেস করলেন কেউ তাকে খুঁজছিল কি না। অতঃপর নিরাশ হয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দুরানি জামা-টামা ছেড়ে শর্টস পরে ফেললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোনটা।

"মিস্টার দুরানি, আপনার জন্যে আমি নীচে অপেক্ষা করে আছি। আপনি কি নীচে নামবেন না ?"

"আমি এইমাত্র নীচে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না," দুরানি রাগত কণ্ঠে বললেন।

"আমি খুব লজ্জিত। আমি আমার এক বন্ধুর খোঁজে একটু সুইমিং পুলের দিকে গিয়েছিলাম। শুনুন, আমি নীচে রিসেপশান কাউণ্টারের সামনে টেপ দুটো নিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনি আসুন, প্লিজ।"

দুরানি তাড়াতাড়ি করে আবার শর্টস ছেড়ে জামা-প্যান্ট-টাই পরে নীচে এলেন। কিন্তু রিসেপশান কাউণ্টারের কাছে কেউ নেই। দুরানি চারদিকে তাকাচ্ছেন এমন সময় একটা থামের আড়াল থেকে কে যেন বলে উঠল, "খুব টেপ-রেকর্ডার পাবার শখ, তাই না ?" দুরানি ঘুরে দেখেন বক্তা আর কেউ নন, তাঁরই রুম-মেট দিলীপ সরদেশাই। দুরানি লজ্জা পেয়েও হেসে উঠলেন। বুঝলেন, দিলীপ ওঁকে খুব ঠকানোই ঠকিয়েছেন।

বুস্ট

সারাদিন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার জন্য সুস্বাদু শক্তিদায়ী পানীয়

আপনার সন্তানটি আজকের এই ধাবমান অগ্রগতির যুগের এক বাড়ন্ত সন্তান।

আজকের এই জটিল ইলেকট্রনিক যুগের সব খেলাই তার জীবনে এক চ্যালেঞ্জ। তার আগ্রহী এবং কৌতুহলী মন এই জটিলতাকে জানবার জন্য সে অনেক বেশী পড়াশুনো করে, অনেক বেশী পরিশ্রম করে-আনন্দ পায়। স্কুলে, টেনিস কোর্টে অথবা যে কোন নতুন খেলাতেই সে পরিশ্রম করতে আগ্রহী কারণ সে সর্বত্রই সর্বাগ্রে থাকতে চায়।

সত্যিই, আপনার সন্তানের আজ এক ক্ষিপ্র, গতিশীল জীবন, এক তীব্রগামী ট্রেনের মতই দুর্বার গতিতে তার দিনগুলি এগিয়ে চলেছে।

বুস্ট – এক চকোলেটের স্বাদে সুস্বাদু শক্তিদাতা

এই স্ফূর্তি ভরা প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডে আপনার সন্তানের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। সুতরাং তার দিনগুলি এক নির্ভরযোগ্য শক্তিদায়ী পানীয় দিয়ে শুরু করাই সর্বোত্তম উপায়।

বুস্ট, ঘন দুধ, সোনালী দানার গম, মল্টেড বার্লি এবং কোকোর মতন শক্তিবর্দ্ধক উপাদানে তৈরী একটি সুস্বাদু পানীয়।

বুস্ট দুধে মিশিয়ে খেতে চমৎকার। সারাদিনের এই প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডের জন্য সজীব ও প্রাণবন্ত রাখতে সকালের জল খাবারের সঙ্গে বুস্ট একটি আদর্শ পানীয়।

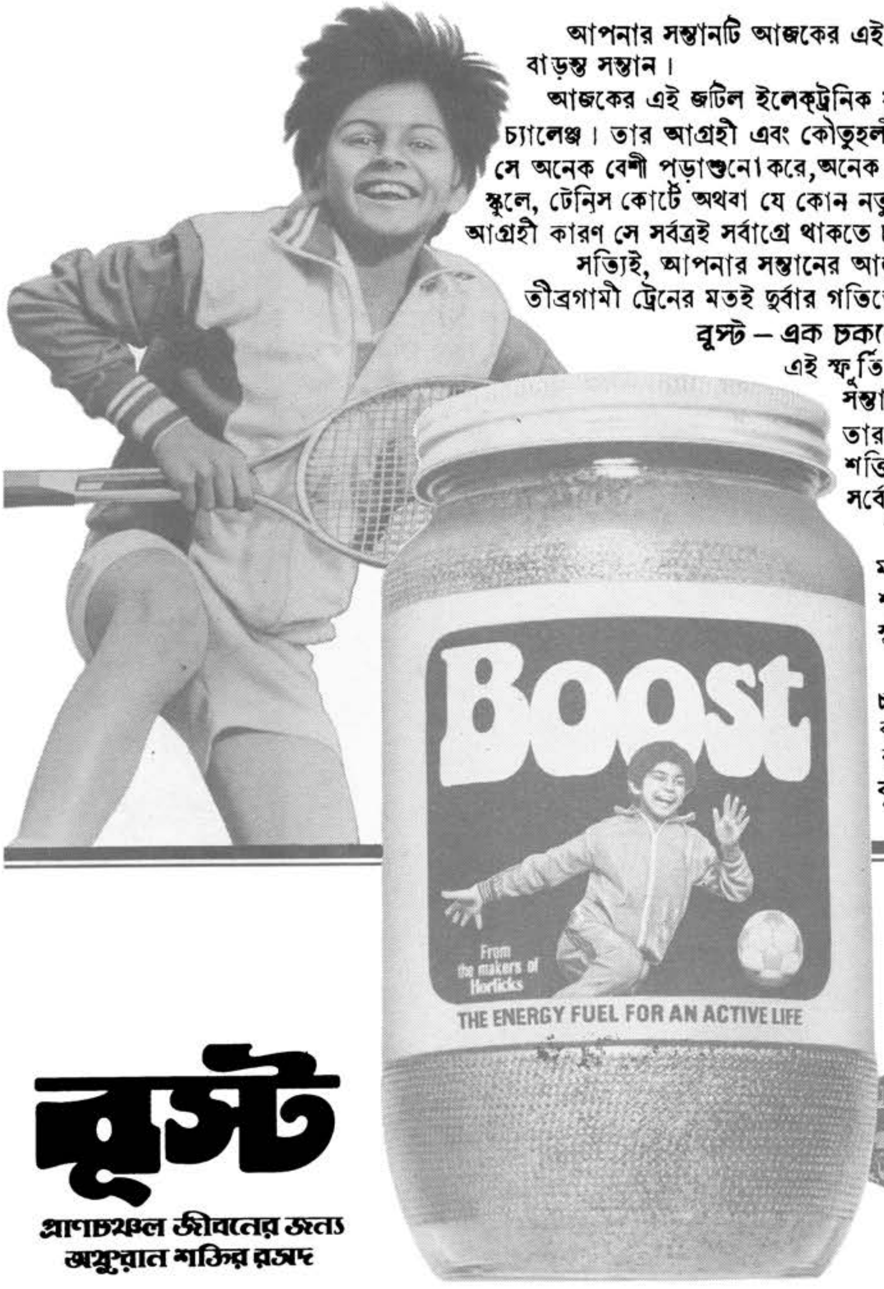
Boost
From the makers of Horlicks
THE ENERGY FUEL FOR AN ACTIVE LIFE

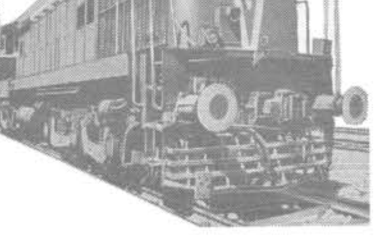

HMM-8734

বুস্ট

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য
অফুরান শক্তির রসদ

ইনি আমার উনি!

গোদরেজ ঘরে এল যেদিন এই ছবি তোলা ঐদিন-ই।

এই শুভ ঘটনা অনেক বছর আগের। …নাম বলতে নেই, তবু জিভ-টিভ কেটে বলেই ফেলি, মোহন মানে আমার ওনার কিন্তু গোদরেজের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দে বড় হওয়ার সব ঘটনাই মনে আছে। আমার বাপের বাড়িতেও ঠিক একই ব্যাপার। সেখানেও গোদরেজ আমাদের বিশ্বস্ত পরিবারজন।

সুতরাং, আমাদের বিয়ের পর নতুন সংসার পাততে প্রথমেই আনলাম গোদরেজ। কারণটা খুবই স্পষ্ট। গোদরেজ যে স্বনামধন্য রেফ্রিজারেটর এটা তো সবার জানা, আর সেইজন্যেই বংশ-পরম্পরায় পরিবারের প্রথম পছন্দের আপনজনা।

এটা তো স্বাভাবিক-ই, গোদরেজ হ'ল এমন এক নামের ঐতিহ্যধারা, যা বছরের পর বছর চমৎকার চলে বংশ-পরম্পরায়। ঘর-সংসারের দরকারে, কারা আর এমন নিখুঁত সামগ্রী তৈরী করে, যা বহুবছর ধরে, পাই-পয়সাটিরও উশুল লাভ দিয়ে চলে।

আমার স্বামী আজও প্রাণ-চাঞ্চল্যে স্বতঃস্ফূর্ত, কর্মঠ, আস্থাভাজন…ঠিক গোদরেজ-টিরই মতন।

আপনাদের বিশ্বস্ত

Godrej® রেফ্রিজারেটর

উৎকৃষ্ট টেকনিকের ফলশ্রুতি…
বহুকাল চমৎকার চলার প্রতিশ্রুতি

GBM-2033

Anandamela 19 February 1986. Regd. No. WB/CC/264. Lic By-South 683TN/MS(c)/731